ডক্টর সাইদ বিন ওয়াহাফ কাহতানি (রহ.) | মুহিব্বুল্লাহ্ খন্দকার
উম্মে আবদে মুনিব | রাজিব হাসান

সালাফদের সিয়াম

প্রথম প্রকাশ
রজব, ১৪৪২ হিজরি / ফেব্রুয়ারী, ২০২১ ঈসায়ী

মুদ্রিত মূল্য : ১৬৪ (একশত চৌষট্টি) টাকা

পরিবেশক
মাতৃভাষা প্রকাশ
১১, পি. কে. রায় রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, ওয়াফী লাইফ, আবাবিল বুকশপ, বুকস টাইম, ইসলাহ শপ
salafibooksbd.com, Islamiboi.com

প্রকাশক
আযান প্রকাশনী
৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা - ১০০০।
+৮৮ ০১৭ ৫৯৫৯ ৯০০৮, ০১৭ ১৭৩১ ৭৯৩১
azanprokashoni.2019@gmail.com
azanprokashoni

বিষয় সূচি

(প্রথম অংশ)

(দ্বিতীয় অংশ)

Contents

(তৃতীয় অংশ)

সালাফদের সিয়াম

(১ম অংশ)

মূল: ডক্টর সাঈদ বিন ওয়াহাফ কাহতানি (রহিমাহুল্লাহ)

অনুবাদ: মুহিববুল্লাহ খন্দকার (গুফিরালাহু)

সম্পাদনা: রাজিব হাসান

অগণিত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার জন্য, অতঃপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর সাথীবৃন্দ এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার অনুসারীবৃন্দের উপর।

নিশ্চয়ই সালাফ আস-সালিহীনদের অবস্থা বড় শানদার ছিল। কেননা, উনারা বুঝতে পেরেছিলেন আল্লাহ তা'য়ালার এই মর্মবাণী —

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"রমাদ্বান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়াত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ, আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্যদিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়াত দান করার দরুন আল্লাহ তা'য়ালার মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।"[১]

এবং বুঝতে পেরেছিলেন নবী কারিম ﷺ এর হাদিসের মর্ম —

إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة

অর্থাৎ যখন রমাদ্বান মাসের প্রথম রাত্রি যখন আগত হয়, তখন সকল শাইত্বন ও অবাধ্য জিনদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, জাহান্নামের সকল দরজা বন্ধ করা হয়, সুতরাং তার একটি দরজাও খোলা হয়না। পরন্তু জান্নাতের সকল দরজা খুলে রাখা হয়, সুতরাং তার একটি দরজাও বন্ধ করা হয় না। আর একজন আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকে এই বলে, হে মঙ্গলকামী! তুমি অগ্রসর হও। আর হে মন্দকামী! তুমি পিছে হটো। (ক্ষান্ত হও)। আল্লাহর জন্য রয়েছে দোজখ হতে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ (সম্ভবতঃ তুমিও তাদের দলভুক্ত হতে পারো)। এরূপ আহ্বান প্রত্যেক রাতেই হতে থাকে।[২]

আর সহীহ বুখারিতে এসেছে "فتحت أبواب السماء" অর্থাৎ "আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়" আর সহীহ মুসলিমে এসেছে "রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়" এবং বুখারি ও মুসলিম উভয় কিতাবে এসেছে "শাইত্বনদেরকে শৃঙ্খলবদ্ধ করা হয়"।[৩]

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন:

قال : دخل رمضان .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "
إن هذا الشهر قد حضركم . وفيه ليلة خير من ألف شهر .
من حرمها فقد حرم الخير كله . ولا يحرم خيرها إلا محروم "

রমাদ্বান মাস শুরু হলে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের নিকট এ মাস সমুপস্থিত। এতে রয়েছে এমন এক রাত, যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। এ থেকে যে ব্যক্তি বঞ্চিত হল সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হল। কেবল বঞ্চিতরাই তা থেকে বঞ্চিত হয়।[৪]

❁ সালাফদের সিয়াম

সালাফগণ বুঝেছেন আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত রাসূল ﷺ এর এই হাদিসটি —

قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

যে ব্যক্তি রমাদ্বান মাসে ইমানের সাথে সাওয়াবের আশায় সিয়াম পালন করবে তার পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি কদরের রাত্রিতে ইমানের সাথে সাওয়াবের আশায় দন্ডায়মান হবে তার পূর্বের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[৫]

আবু হুরায়রা (রা) এর আরেকটি হাদিসে এসেছে,

من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

"যে ব্যক্তি রমাদ্বান মাসে ইমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রাত্রিতে দন্ডায়মান হবে (অর্থাৎ কিয়ামুল লাইল) তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"[৬]

এই সকল দলিল আদিল্লার কারণেই সালাফ আস-সালিহীনগণ রমাদ্বান মাসে নেক আমাল করার ব্যাপারে একধাপ এগিয়ে থাকতেন। বেশি বেশি চেষ্টা ও মেহনত করতেন। এই দলিলগুলোই সালাফদেরকে রমাদ্বান মাসে আমলে ব্যস্ত রাখতে বাধ্য করত। এর ফলে বরকতময় এই মাসে উনারা আল্লাহর ইবাদাতে পরিপূর্ণ হালতে পৌঁছে যেতেন।

ইমাম ইবনু রজব (রহ) বলেন, "কোন কোন সালাফ আল্লাহর কাছে ছয়মাস দুআ করতেন যেন তাদেরকে রমাদ্বান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়, অতঃপর ছয়মাস দুআ করতেন তাদের রমাদ্বানের আমলগুলো যেন কবুল করে নেওয়া হয়।"[৭]

কোন কোন সালাফ বলতেন,

اللهم سلمني لرمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا

"হে আল্লাহ আমাকে রমাদ্বান পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছিয়ে দেন, রমাদ্বানকে আমার পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন এবং আমার কাছ থেকে তা কবুল করুন।"

অনুবাদকের টীকাঃ এ ব্যাপারে ইমাম সুয়ুতি (রহ) এর একটি আছার পাওয়া যায়। তিনি তাঁর জামিউল আহাদিসে উবাদা বিন সামিত (রাঃ) থেকে উল্লেখ করে বলেন —

عن عبادة بن الصامت قال : كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يعلمنا هؤلاء الكلمات إذا جاء رمضان اللهم سلمنى لرمضان وسلم رمضان لى وتسلمه منى متقبلا (الطبرانى فى الدعاء، والديلمى وسنده حسن) [كنز العمال

হযরত উবাদাহ বিন সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রমাদ্বান চলে আসত, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এই সকল কালিমা শিখাতেন,

"হে আল্লাহ আমাকে রমাদ্বান পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছিয়ে দেন, রমাদ্বান আমার পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন এবং আমার কাছ থেকে তা কবুল করুন।"[৮]
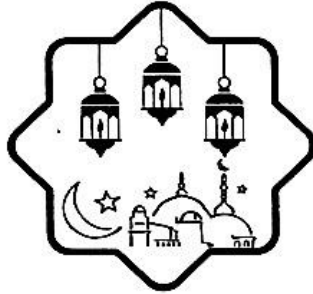
তথ্যসূত্র:

১। সুরা বাকারাহ, আয়াতঃ ১৮৫
২। তিরমিজি: ৬৮২, ইবনু মাজাহ: ১৬৪২, ইবনু খুযাইমাহ: ১৮৮৩, ইবনু হিব্বান: ৩৪৩৫, বাইহাকি: ৮২৮৪, হাকিম: ১৫৩২, সহিহ তারগিব: ৯৯৮, নাসায়ি: ২০৯৭
৩। সহীহ বুখারি: ১৮৯৮ ও ১৮৯৯, সহীহ মুসলিম: ১০৭৯
৪। নাসায়ি: ১৬৪৪
৫। বুখারি: ২০১৪, মুসলিম: ৭৬০
৬। বুখারি: ২০৯, মুসলিম: ৭৫৯
৭। লাতায়েফুল মাআরেফ: ৩৭৬, আর ইমাম সুয়ুতি এই আছারটি তার তাফসির আদদুররুল মানছুরে উল্লেখ করেন: ১/৪৫৪]
৮। তাবারানি, দায়লামি। সনদ হাসান। [কানজুল উম্মাল: ২৪২৭৭] –

❁ সালাফদের সিয়াম

রমাদ্বানের বরকতময় মাসে নবীজি ﷺ ও সালাফদের চেষ্টা মেহনতের বেশ কিছু দলিল পাওয়া যায়। নিম্নবর্ণিত ঘটনাগুলো যার স্বাক্ষী —

১। রমাদ্বানে দান ও সদকার আধিক্য

রাসুল ﷺ ছিলেন সবচেয়ে দানশীল ব্যক্তি। রমাদ্বানে জিবরীল উপস্থিত হলে তিনি আরো বেশি দানশীল হয়ে উঠতেন। রমাদ্বানের বরকতময় মাসে যখন জিবরীল (আঃ) নবীজি ﷺ এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতেন, তখন তিনি রহমতের বায়ু অপেক্ষা অধিক দানশীল হতেন।[৯]

২। একে অপরকে কুরআন শোনানো

জিবরীল (আঃ) প্রতি বছর রমাদ্বান মাসে নবীজি ﷺ এর সাথে বিশেষ সাক্ষাৎ করতে আসতেন। রমাদ্বানের প্রতিরাতে তিনি এসে রাসুল ﷺ কে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন, অতঃপর রাসুল ﷺ জিবরীলকে শোনাতেন।

সহিহ হাদিসে এসেছে:

> عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة

> হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আল্লাহর রাসুল ﷺ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল। রমাদ্বান মাসে তিনি আরো অধিক দানশীল হতেন, যখন জিবরাইল (আঃ) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। আর রমাদ্বানের প্রতিরাতেই জিবরীল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তারা একে অপরকে কুরআন শোনাতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসুল ﷺ রহমতের বায়ু অপেক্ষা অধিক দানশীল ছিলেন।[১০]

❉

অপর এক হাদীসে এসেছে,

عن عائشة عن فاطمة عليها السلام أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي

মাসরুক (রহ) হযরত আয়িশা (রাদিঃ) এর মাধ্যমে হযরত ফাতিমা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, "নবীজি ﷺ আমাকে গোপনে বলেছেন, প্রতি বছর জিবরীল আমার সঙ্গে একবার কুরআন শোনান ও শোনেন; কিন্তু এ বছর তিনি আমার সঙ্গে দু'বার এ কাজ করেন। আমার মনে হচ্ছে আমার মৃত্যু আসন্ন।"(১১)

তথ্যসূত্র:

৯। বুখারি: ৬, মুসলিম: ২৩০৮
১০। বুখারি: ৬, ১৯০২,৩২২০,৩৫৫৪, ৪৯৯৭, মুসলিম: ৩২০৮, আহমাদ: ৩৬১৬
১১। বুখারি: ৪৯৯৭ নং হাদিসের পূর্বে ক্রমিক বিহীন হাদিস

৩। মা আয়িশার (রাঃ) চোখে নবীজির ﷺ রমাদ্বান

নবীজি ﷺ রমাদ্বানের শেষ দশকে বেশী বেশী ইবাদাত করতেন, যা অন্য কোন সময় করতেন না। হযরত আ'য়িশা (রাঃ) বলেন,

> "আল্লাহর রাসুল ﷺ রমাদ্বানে শেষ দশকে এত চেষ্টা মেহনত করতেন যা অন্য কোন মাসে করতেন না।" [১২]

তিনি আরো বলেন,

> عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله
>
> "যখন রমজানের শেষদশ প্রবেশ করত তখন রাসুল সাঃ কোমরে কাপড় বেঁধে নেমে পড়তেন, রাত্রি জাগরণ করতেন এবং তাঁর পরিবারবর্গকে জাগাতেন।[১৩]

আয়িশা (রাঃ) আরো বলেন,

> নবীজি ﷺ রমাদ্বানের প্রথম দুই দশক সালাত ও ঘুম দ্বারা মিলাতেন। অতঃপর শেষ দশকে আসত তিনি লুঙ্গি কষে বাঁধতেন।[১৪]

আয়িশা (রাঃ) হতে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন,

> "আমি রাসুল ﷺ কে একমাত্র রমাদ্বান ব্যতীত দেখিনি, রাত্রিতে সুবহে সাদিক পর্যন্ত সালাতে দাঁড়িয়ে থাকতে এবং পুরোটা মাস একাধারে রোজা রাখতে।"[১৫]

তথ্যসূত্র:

১২। মুসলিম: ১১৭৫
১৩। বুখারি: ১০৫৩
১৪। মুসনাদ আহমাদ: ৪০/১৫৯ হাদিস নং ২৪১৩১
১৫। মুসলিম: ৭৪৬

৪। লাইলাতুল কদরের তালাশ

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

"তোমরা রমাদ্বানের শেষ দশকে বেজোড় রাত্রিতে লাইলাতুল কদরের তালাশ করো।"[১৬]

ভিন্ন শব্দে আরো অন্য এক হাদীসে নবী ﷺ বলেন,

تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان

তোমরা রমাদ্বানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদর তালাশ করো।[১৭]

লাইলাতুল কদর জোড় রাত্রিতেও হতে পারে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদিসে এসেছে,

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন — التمسوا في أربع وعشرين

"তোমরা তা তালাশ কর চব্বিশতম রজনিতে।"[১৮]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر
هي في تسع يمضين أو في سبع يبقين يعني ليلة القدر

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, তা শেষ দশকে, তা অতিবাহিত নবম রাতে অথবা অবশিষ্ট সপ্তম রাতে অর্থাৎ লাইলাতুল কদর।[১৯]

অন্য এক সুত্রে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন,

التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر
في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى

তোমরা লাইলাতুল কদর রমাদ্বানের শেষ দশকে অনুসন্ধান করো। লাইলাতুল কদর (শেষ দিক হতে গণনায়) নবম, সপ্তম বা পঞ্চম রাত অবশিষ্ট থাকে।[২]

সাহাবায়ে কিরামগণও রমাদ্বানের শেষ দশদিনে ইবাদতে অনেক পরিশ্রম করতেন। আম্মাজান আয়িশা (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি লাইলাতুল কদর সম্পর্কে জানতে পারি তাহলে সে রাতে কি বলব? তিনি বললেন, তুমি বলো —

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني

"আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুব্বুন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নী"

'হে আল্লাহ! তুমি সম্মানিত ক্ষমাকারী, তুমি ক্ষমা করতেই ভালোবাসো, অতএব তুমি আমাকে মাফ করে দাও'।[২১]
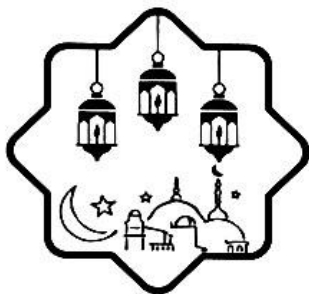
তথ্যসূত্র:

১৬। বুখারি: ২০১৭
১৭। বুখারি: ২০২০
১৮। বুখারি: ২০২২
১৯। বুখারি: ২০২২
২০। বুখারি: ২০২১
২১। জামিউত তিরমিজি: ৩৫৩১, সুনানে ইবনু মাজাহ: ৩৮৫০

৫। কিয়ামুল লাইল

তারাবীহ'র নামকরণ করার কারণ হল, এই সলাতে প্রত্যেক চার রাকাআতের পর বিশ্রাম নেওয়া হয়। আর তারাবীহকেই রমাদ্বান মাসে রাতের প্রথমাংশের কিয়ামুল লাইল। প্রত্যেক দুই সালামের পর অর্থাৎ চার রাকআত আদায় করে পর এই সলাতে বিশ্রাম নেওয়া হয়ে থাকে। হযরত আয়িশা (রাঃ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, রমাদ্বানে আল্লাহর রাসূল ﷺ এর সালাত কেমন ছিল? আয়িশা (রাঃ) বলেন,

> "আল্লাহর রাসুল ﷺ রমাদ্বান এবং রমাদ্বানর বাইরে এগারো রাকাআতের বেশি পড়তেন না; তিনি চার রাকআত পড়তেন, তোমরা আমাকে তার সৌন্দর্য এবং দীর্ঘতার ব্যাপারে প্রশ্ন করো না, অতঃপর পড়তেন চার রাকআত, তোমরা আমাকে তার সৌন্দর্য এবং দীর্ঘতার ব্যাপারে প্রশ্ন করো না, তারপর তিন রাকআত পড়তেন।"[২২]

আয়িশা (রাঃ) এর উক্তি "তিনি চার রাকআত পড়তেন...অতঃপর চার রাকআত..." এটি প্রথম চার রাকআতের সাথে দ্বিতীয় চার রাকআত এবং শেষের দিন রাকআত আলাদা তা প্রমাণ বহন করে। আর তিনি চার রাকআতের মাঝে প্রত্যেক দুই রাকআতের পর সালাম ফিরিয়েছেন তাও প্রমাণ বহন করে আয়িশা (রাঃ) এর হাদিসের কারণে। কেননা আয়িশা (রাঃ) অপর হাদিসে বলেন,

> "রাসুলুল্লাহ ﷺ রাত্রিবেলায় এগার রাকআত পড়তেন এবং এক রাকআতের বিতর করতেন।
>
> অন্য শব্দে আছে, "তিনি প্রত্যেক দুই রাকআতে সালাম ফিরাতেন এবং এক রাকআত দ্বারা বিতর করতেন।"[২৩]

আর এটি প্রথম হাদিসের ব্যাখ্যা। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক দুই রাকআতের পর সালাম ফিরাতেন। অন্য এক হাদিসে এসেছে, "রাত্রিবেলার সালাত দু'রাকআত দু'রাকআত করে।"[২৪]

❋ সালাফদের সিয়াম

ইমাম নববি (রহঃ) কিয়ামুল লাইল বা তারাবীহ'র ব্যাপারে বলেন, "এটি মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে সকল উলামাহ একমত।"[২৫]

তারাবীহ'র ক্ষেত্রে উত্তম হল, ইমামের পিছনে ততক্ষণ থাকা যতক্ষণ না তিনি সলাত শেষ করেন। আবু যর (রাঃ) এর এক হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন,

> "আমরা রাসুল ﷺ এর সাথে রমাদ্বান মাসের সিয়াম পালন করেছি। তিনি এ মাসের সাত দিন বাকি থাকার আগ পর্যন্ত আমাদের নিয়ে সালাতে দাঁড়াননি। তিনি আমাদের নিয়ে সে রাত্রিতে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সালাতে দাঁড়ানো ছিলেন। অতঃপর মাস বাকি থাকার ষষ্ঠ দিনে দাঁড়াননি। তারপর মাস বাকি থাকার পঞ্চম রাতে দাঁড়ালেন এমনকি অর্ধরাত অবধি দাঁড়ানো ছিলেন। আমরা তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি এই রাত্রের বাকি সময়েও আমাদের নিয়ে নফল সালাত আদায় করতেন? রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে প্রস্থান করা অবধি সালাত আদায় করবে (কিয়ামুল লাইল করবে) তাকে পুরো রাত কিয়ামুল লাইলের নেকি দান করা হবে। রাসূল ﷺ আমাদের নিয়ে চতুর্থ রাত্রিতে কিয়ামুল লাইল করেননি। তৃতীয় রাতে তার পরিবার, স্ত্রীগণ ও লোকজনকে জমা করলেন এবং আমাদের সাথে নিয়ে সেহরির শেষ সময় পর্যন্ত কিয়ামুল লাইল করলেন, এমনকি আমরা চিন্তিত ছিলাম সেহরি খেতে পারব কিনা? অতঃপর মাসের বাকি রাতগুলোতে আমাদের নিয়ে দন্ডায়মান হননি।"[২৬]

আম্মাজান আয়িশা (রাঃ) এর হাদিসে এসেছে,

> রাসুলুল্লাহ ﷺ কোন এক রাতের মধ্যভাগে বের হলেন এবং মাসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করলেন, সকালে তাঁরা এ নিয়ে আলোচনা করলেন। ফলে (দ্বিতীয় রাতে) এর চেয়ে অধিক সাহাবা একত্রিত হলেন এবং তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলেন। পরের দিন সকালেও তাঁরা এ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। ফলে তৃতীয় রাতে মাসজিদে লোকসংখ্যা অত্যাধিক বৃদ্ধি পেল। আল্লাহর রাসুল ﷺ বের হলেন এবং সাহাবিগণ তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলেন। কিন্তু চতুর্থ রাতে লোক সংখ্যা এত

বেশি হল যে, মাসজিদে জায়গা সংকুলান হল না। কিন্তু রাতে রাসুল ﷺ মাসজিদে আসলেন না। তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক 'সলাত' বলে ডাকতে শুরু করল। কিন্তু তিনি ঐ রাতে আর বের হলেন না। অবশেষে তিনি ফজরের সলাতের জন্য বের হলেন এবং ফজরের সলাত শেষ করে লোকদের দিকে ফিরলেন। অতঃপর আল্লাহর হামদ ও ছানা বর্ণনা করলেন। অত''পর বললেন, "আম্মা বা'দ (অতপর বক্তব্য এইযে) এখানে তোমাদের উপস্থিতি আমার নিকট গোপন ছিল না, কিন্তু আমার আশঙ্কা ছিল, তা তোমাদের জন্য ফরজ করে দেওয়া হয় আর তোমরা তা আদায় করতে অপারগ হয়ে পড়।[২৭]

ইমাম ইবনু রজব (রহ) বলেন,

"হযরত উমার (রাঃ) সাহাবী উবাই বিন কা'ব এবং তামিম আদদারি (রাঃ) কে আদেশ দেন তারা যেন রমাদ্বান মাসে লোকদেরকে সাথে নিয়ে কিয়ামুল লাইল তথা তারাবীহ'র সালাত আদায় করেন। তখন ঈমাম সাহেব এক রাকাআতে দুইশত আয়াত তিলাওয়াত করতেন। এমতবস্থায় তারা লম্বা কিয়ামের কারণে লাঠির উপর ভর দিয়ে থাকতেন। আর উনারা এ থেকে বিরত হতেন কেবল ফজরের সময় হয়ে আসলে। অতঃপর তাবিয়িদের যুগে রমাদ্বানের কিয়ামুল লাইলে উনারা প্রত্যেক আট রাকাআতে সুরা বাকারাহ পড়তেন। উনারা যদি বারো রাকাআত পড়তেন তাহলে সেটি (সুরা বাকারাহ) তাদের নিকট হালকা মনে হত।"[২৮]

ইমাম ইবনু রজব আরো বলেন, "ইমাম আহমদ (রহ) তার কোন কোন সাথীকে বলেন (যাদেরকে নিয়ে তিনি রমাদ্বানে সালাত আদায় করতেন), "এই জাতি হল দুর্বল জাতি, পাঁচ, ছয়, সাত আয়াত করে পড়ো।" তিনি বলেন, "আমি পড়েছি এবং সাতাশতম রাত্রিতে খতম করেছি।"[২৯]

হাসান আল বসরি (রহ) বলেন,

"উমার (রাঃ) লোকদেরকে নিয়ে রমাদ্বানের রাত্রিতে সলাত আদায় করতে বললে, তিনি পাঁচ আয়াত বা ছয় আয়াত করে তিলাওয়াত করেন।"[৩০]

আর ইমাম আহমদ (রহ) এর কথা প্রমাণ করে যে, তিনি মুক্তাদীদের অবস্থার উপর বিবেচনা করে কুরআন তিলাওয়াতের কথা বলেছেন। যাতে তাদের উপর কোন কষ্ট না হয়।

তাকে ব্যতীত অন্যান্য ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে ঈমাম আবু হানিফা (রহ) এর সাথীবর্গ ও অন্যান্য সালাফগণ এরূপ বলেছেন। আর আবু যর (রাঃ) এর বর্ণনা থেকে জানা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ তাদেরকে নিয়ে তেইশতম রাত্রিতে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত কিয়ামুল লাইল আদায় করেছেন এবং পঁচিশতম রাত্রিতে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত। তখন সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) তাকে বলেন, "যদি আপনি আমাদের নিয়ে বাকি রাতও নফল সলাত আদায় করতেন? অতঃপর তিনি ﷺ বলেন 'নিশ্চয় ব্যক্তি যখন ইমামের সঙ্গে সালাত আদায় করে, এমনকি যখন সে (ইমামের সাথেই) তা থেকে বিরত হয় তার জন্য বাকি রাতের (সলাত আদায়ের) সাওয়াব লিখা হয়।' আহলুস সুনাহ এটিকে তাখরিজ করেছেন। ইমাম তিরমিজি এটি হাসান বলেছেন।[৩১]

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ. ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ. يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ

আবদুর রাহমান বিন আবদিল কারি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:,

"আমি রমাদ্বানের এক রাত্রিতে উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এর সাথে মাসজিদে নববিতে বের হলাম। হঠাৎ দেখা গেল যে, লোকেরা এলোমেলোভাবে বিভিন্ন

জামাআতে বিভক্ত। কেউ একাকী সালাত আদায় করছে আবার কোন ব্যক্তি সলাত আদায় করছে এবং লোকেরা তাঁর ইকতিদা করে সলাত আদায় করছে। উমর (রাঃ বললেন, 'আমি মনে করি যে, এই লোকদের যদি একজন ক্বারীর (ইমাম) পিছনে জমা করে দেই, তবে তা উত্তম হবে।' এরপর তিনি উবাই বিন কা'ব (রাঃ) এর পেছনে সকলকে জমা করে দিলেন। পরে আরেক রাতে আমি তাঁর সাথে বের হই। তখন লোকেরা তাদের ইমামের সাথে সালাত আদায় করছিল। উমর (রাঃ) বললেন, 'কতই না সুন্দর এই বিদআত (নতুন ব্যবস্থা।) তোমরা রাতের যে অংশে ঘুমিয়ে থাকো তা রাতের ঐ অংশ অপেক্ষা উত্তম যে অংশে তোমরা সালাত আদায় করো'। এর দ্বারা তিনি শেষ রাত বুঝিয়েছেন, কেননা তখন রাতের প্রথমভাগে লোকেরা সলাত আদায় করত।[৩২]

আমি শাইখ ইমাম আবদুল আজিজ ইবন বাজ (রহ) কে উমর (রাঃ) এর نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ (কতই না সুন্দর এই বিদাআত) এই কথার ব্যাপারে বলতে শুনেছি যে তিনি বলেন – "এখানে বিদআত দ্বারা শাব্দিক বিদআত উদ্দেশ্য (আমলগত নয়), আর এখানে উদ্দেশ্য হল তারা নতুনভাবে রমাদ্বান মাসজুড়ে জামাআতবদ্ধভাবে সলাত আদায় করেছে। আর এটি উমর (রাঃ) এর উক্তির কারণ।"[৩৩]

হযরত নুমান বিন বাশির (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

> "আমরা একবার (রমাদ্বানের) তেইশতম রাত্রিতে রাসূল ﷺ এর সাথে রাত্রের প্রথম এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সলাতে দন্ডায়মান ছিলাম। অতঃপর আমরা তাঁর সাথে পঁচিশতম রাত্রিতে অর্ধরাত্র পর্যন্ত সলাতে দন্ডায়মান ছিলাম, অতপর আমরা সাতাইশতম রাত্রিতে এত পরিমাণ দন্ডায়মান ছিলাম যে, আমরা মনে করলাম যে 'ফালাহ' পাব না। আর সাহাবীগণ সাহরিকে 'ফালাহ' নামে বলতেন।"[৩৪]

আর আবু যর (রাঃ) এর হাদিসে আমরা জেনেছি, "যখন সাতাইশতম রাত্রি আসত নবীজি ﷺ তাঁর পরিবার এবং মহিলাদেরকে একত্রিত করতেন আর লোকদেরকে নিয়ে কিয়ামুল লাইল আদায় করতেন।"

❉ সালাফদের সিয়াম

সালাতুত তারাবীহ'র রাকাত সংখ্যা কত? সালাতুত তারাবীহ'র কোন নির্দিষ্ট রাকআত নেই। এর কোন সীমারেখা বেঁধে দেওয়া নেই। রাকআত সংখ্যা নির্ধারিত নেই। নবীজি ﷺ কেবল বলেছেন,

> صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى
>
> "রাতের সলাত দুই দুই (রাকাআত) করে। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি আশঙ্কা করে ফজরের, সে যেন এক রাকআত সলাত আদায় করে নেয়। আর সে যে সলাত আদায় করল (এক রাকআত), তা তার জন্য বিতর হয়ে যাবে।"(৩৫)

সুতরাং বিশ রাকআত পড়েন আর তিন রাকআত বিতর অথবা ছত্রিশ রাকআত পড়েন আর তিন রাকআত বিতর কিংবা একচল্লিশ রাকআত পড়েন তাতে কোন অসুবিধা নেই।(৩৬)

কিন্তু উত্তম হল যা রাসূলুল্লাহু ﷺ করেছেন। আর তা হল, তের রাকআত অথবা এগারো রাকআত। কেননা ইবনু আব্বাস (রাঃ) এর হাদিস এসেছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রিতে তের রাকআত পড়তেন।(৩৭)

> আর আয়িশা (রাঃ) এর হাদিসে এসেছে, "রাসুলুল্লাহ ﷺ রমাদ্বান ও এর বাইরে বাইরে এগারো রাকআতের বেশি পড়তেন না।(৩৮)

সুতরাং এটিই হল উত্তম এবং সাওয়াবের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ।

আর কেউ যদি এর চেয়ে বেশি পড়ে তাহলে কোন অসুবিধে নেই। কেননা রাসুল ﷺ এর এই হাদিসে বলা আছে,

> صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم
> الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى
>
> "রাতের সলাত দুই দুই রাকাআত করে। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ফজরের আশঙ্কা করে সে যেন এক রাকআত সালাত আদায় করে নেয়। আর সে যে সালাত আদায় করল তার জন্য বিতর হয়ে যাবে। "

কাজেই কিয়ামুল লাইল বা তারাবীহ'র রাকআতের ক্ষেত্রে প্রশস্ততা রয়েছে। এখানে বাড়াবড়ির কোন স্থান নেই। তবে, উত্তম হল এগারো রাকআত পড়া। আল্লাহই তাওফীক দানকারী।[৩৯]

তথ্যসূত্র:

২২। বুখারি: ১১৪৭, মুসলিম: ৭৩৮
২৩। মুসলিম: ৭৩৬
২৪। বুখারি: ৯৯০, মুসলিম: ৭৪৯
২৫। শরহুন নববি আলা সহিহ মুসলিম: ৬/২৮৬
২৬। তিরমিজি: ৮০৬, আবু দাউদ: ১৩৭৫, নাসায়ি: ১৬০৫, আহমাদ: ৫/১৫৯, ইবনু মাজাহ
২৭। বুখারি: ৯২৪, মুসলিম: ১৬৬৯
২৮। লাতায়েফুল মাআরেফ: ৩১৬
২৯। লাতায়েফুল মাআরেফ: ৩১৬
৩০। লাতায়েফুল মাআরেফ: ৩১৬
৩১। লাতায়েফুল মাআরেফ: ৩১৬
৩২। বুখারি: ২০১০
৩৩। ডক্টর সাইদ বিন ওয়াহাফ কাহতানি (রহ) শাইখ বিন বায (রহ) এর বুখারির ২০১০ নং হাদিসের দরসে শুনেছিলেন।
৩৪। সুনানুন নাসায়ি: ১৬০৬
৩৫। বুখারি: ৯৯০, মুসনাদ আহমাদ: ৪৮৪৮
৩৬। সুনানুত তিরমিজি: ৩/১৬১, আল মুগনি লিইবনি কুদামাহ: ২/৬০৪, ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়াহ: ২৩/১১২-১১৩]
৩৭। সহিহ মুসলিম: ৭৬৪
৩৮। বুখারি: ১১৪৭, মুসলিম: ৭৩৮
৩৯। দেখুন: ফাতাওয়া ইমাম বিন বাজ: ১১/৩২০-৩২৪

৬। সালাফদের কুরআন তিলাওয়াত

ইমাম ইবনু রজব (রহ) বলেন,

কোন কোন সালাফ রমাদ্বানের কিয়ামুল লাইলে প্রত্যেক তিন রাত্রে কুরআন খতম করতেন। কোন কোন সালাফ প্রত্যেক সাত রাত্রে; তন্মধ্যে কাতাদাহ, কোন কোন সালাফ প্রত্যেক দশ রাত্রে এক খতম করতেন। তাদের মাঝে রয়েছেন আবু রাজা আত্তারিদি, কোন কোন সালাফ রমাদ্বানের সলাতে এবং সলাত ছাড়া তিলাওয়াত করে খতম করতেন। আসওয়াদ (রহ) রমাদ্বানের প্রত্যেক দুই রাতে খতম করতেন আর নাখয়ি (রহ) বিশেষ করে তা করতেন শেষ দশকে। আর মাসের অন্যান্য সময়ে প্রত্যেক তিন রাতে। কাতাদাহ (রহ) সাতদিনে কুরআন খতম করতেন এবং রমাদ্বানের প্রত্যেক তিনরাতে ও রমাদ্বানের শেষ দশকে প্রতিরাতে এক খতম করতেন। আবু হানিফা (রহ) রমাদ্বানে সালাত ব্যতীত ষাট খতম করতেন। ইমাম শাফি'ঈ (রহ) এর ব্যাপারেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। আর কাতাদা (রহ) রমাদ্বানে কুরআন দেখে দেখে পড়তেন।[৪০]

ইমাম যুহরি (রহ) রমাদ্বান মাস উপস্থিত হলে বলতেন,
"নিশ্চয় এ মাসটি কুরআন তিলাওয়াত এবং খাবার খাওয়ানোর মাস।[৪১]

ইমাম বুখারি (রহ) এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি রমাদ্বান মাসে চল্লিশবারের বেশি খতম করতেন। ইমাম যাহাবী (রহ) বলেন, "মুসাব্বিহ বিন সাইদ বলেছেন, মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বুখারি রমাদ্বানের প্রত্যেক দিনে এক খতম করতেন এবং তারাবীহ'র পর প্রত্যেক তিনদিনে এক খতম করতেন।[৪২]

হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি (রহ) বলেন, "মুকসিম ইবনু সাইদ বলেছেন, রমাদ্বান মাসে ঈমাম বুখারির কাছে রাতের প্রথম ভাগে তার সাথীবৃন্দ জমায়েত

হত। তিনি তাদেরকে নিয়ে সলাত আদায় করতেন। প্রতি রাকআতে বিশ আয়াত তিলাওয়াত করতেন। এভাবেই তিনি কুরআন খতম করতেন। আর সাহরির সময় অর্ধেক থেকে এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করতেন। আর প্রতি রাতে ইফতারের সময় তার খতম সম্পন্ন হত। আর তিনি বলেন, প্রত্যেক খতমের সময় কবুল দুআ রয়েছে।"[৪৩]

মুহাম্মাদ বিন আবি হাতিম আল ওয়াররাক (রহ) বলেন, "আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারি) সাহরির সময়ে তের রাকআত সালাত আদায় করতেন এবং এক রাকআতে বিতর করতেন।"[৪৪]

ইমাম ইবনু রজব (রহ) বলেন, "ইবনু আবদিল হিকাম বলেছেন, রমাদ্বান মাস উপস্থিত হলে, ইমাম মালিক (রহ) হাদিসের মজলিস এবং আহলে ইলমের সাথে বসতেন না। কুরআনের নিয়ে তিলাওয়াত করার জন্য বসে যেতেন।" [৪৫]

আবদুর রাজ্জাক (রহ) বলেন, "সুফিয়ান আস-সাওরি (রহ) রমাদ্বান আসলে অন্য সকল (নফল) ইবাদত ছেড়ে দিয়ে কুরআন তিলাওয়াতে মনোযোগ দিতেন। আয়িশা (রাঃ) রমাদ্বান মাসে দিনের প্রথমাংশে মুসহাফ নিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। অতঃপর যখন সূর্য উদিত হত তখন ঘুমাতেন। [৪৬]

আর সুফিয়ান আস-সাওরি (রহ) বলেন,

যুবাইদ ইলয়ামি (রহ) যখন রমাদ্বান মাস আসত তখন কুরআনের মুসহাফ জমা করতেন এবং সাথীদেরকে (তিলাওয়াত করার জন্য) একত্রিত করতেন।[৪৭]

❁ সালাফদের সিয়াম

ইমাম নববি (রহ) কুরআন তিলাওয়াতের ব্যাপারে বলেন,

"কুরআন তিলাওয়াতে মনোযোগী হওয়া এবং বেশি বেশি তিলাওয়াত করা আবশ্যক। সালাফগণ তাদের সাধ্যানুযায়ী খতম করতেন। এটা উনাদের অভ্যাস ছিল।"[৪৮]

ইবনু আবু দাউদ (রহ) কোন কোন সালাফ সম্পর্কে বলেন,

তারা প্রত্যেক দুই মাসে এক খতম কুরআন পড়তেন। কেউ কেউ প্রত্যেক দশরাত্রিতে এক খতম, কেউ কেউ প্রত্যেক আট রাত্রিতে এক খতম, আর অধিকাংশরা প্রত্যেক সাত রাত্রিতে এক খতম করতেন। কেউ কেউ প্রত্যেক ছয় রাত্রিতে, কেউ কেউ প্রত্যেক পাঁচদিনে, কেউ কেউ প্রত্যেক চার রাত্রিতে এবং অনেকেই প্রতি তিন দিনে এক খতম কুরআন তিলাওয়াত করতেন। কারো কারো ব্যাপারে জানা যায়, তারা প্রতি দুই রাতে, কেউ কেউ একদিন-একরাতে এক খতম, কেউ কেউ একদিন-একরাতে দুই খতম, কেউ কেউ দিনে-রাতে তিন খতম আর কেউ কেউ আট খতম; কেউ চার খতম দিনে আর চার খতম রাতে করতেন। যারা দিনে-রাতে এক খতম দিয়েছেন তাদের মাঝে রয়েছেন, আমীরুল মুমিনীন উসমান ইবনু আফফান (রা), তামিম আদ দারি (রা), সাইদ ইবনু জুবাইর (রা), মুজাহিদ (রহ) এবং ঈমাম শাফিয়ি (রহ) প্রমূখ ও অন্যান্য।[৪৯]

আর যারা দিনে তিন খতম দিতেন তাদের মাঝে রয়েছেন, সালিম বিন ঈতর (রা) যিনি মুয়াবিয়া (রাঃ) এর শাসনামলে মিশরের কাজি ছিলেন।

আর যারা এক সপ্তাহে কুরআন খতম করতেন তাদের সংখ্যা অনেক। যেমন, উসমান ইবনু আফফান, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, যায়দ ইবনু সাবিত, উবাই ইবনু কা'ব (রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওইয়া আজমাইন) এবং তাবিয়িদের এক জামাআত; যেমন, আবদুর রাহমান ইবনু ইয়াজিদ, আলকামাহ ও ইবরাহিম (রাহিমাহুমুল্লাহ) প্রমূখ।[৫০]

আল্লামা ইমাম আন নববি (রহ) বলেন,

"সালাফদের এই কুরআন খতমে ইখতিয়ার করাটা ব্যক্তির অবস্থাভেদে পরিবর্তিত হয়েছে। সুতরাং গভীর চিন্তাভাবনার কারণে সুক্ষাতিসুক্ষ বিষয় যদি প্রকাশ হয়ে যায় সে যেন ততটুকু পরিমাণ তিলাওয়াতের পর ইকতিসার করে (ক্ষ্যান্ত দেয়)। অনুরূপ যে ব্যক্তি ইলমের প্রচার ও প্রসারে নিয়োজিত অথবা দ্বীনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খেদমতে নিয়োজিত এবং মুসলিম উম্মাহর কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত তারও উচিত ততটুকু পরিমাণ তিলাওয়াত করা যাতে এর কারণে সে যে গুরুত্ববহ কাজে নিয়োজিত তার যেন কোন ব্যাঘাত না ঘটে। আর যদি সে উল্লেখিত ব্যক্তিদের মধ্য হতে না হয়ে থাকে, তাহলে সে যেন তার সামর্থ্য অনুপাতে অস্বস্তির পর্যায়ে না গিয়ে এবং অনর্থক কথাবার্তা বাদ দিয়ে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করে। যদিও পূর্ববর্তীদের একটি জামাআত একদিন একরাতে কুরআন খতম করাকে অপছন্দ করেছেন। এবং এর পক্ষে আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণিত হাদিস রয়েছে।

> তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তিনদিনের কম সময়ে কুরআন খতম করবে সে মর্ম বুঝবে না।"[৫১]

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু রজব (রহ) বলেন,

"তিনদিনের কম সময়ে কুরআন খতমকে কেবল সর্বদা পাঠ করার জন্য নিষেধারোপ করা হয়েছে। তবে বিভিন্ন ফজিলতপূর্ণ সময়, যেমন রমাদ্বান মাস বিশেষত সে সকল রাতে যাতে লাইলাতুল কদর তালাশ করা হয় অথবা বিভিন্ন ফজিলতপূর্ণ স্থান (যেমন মক্কায় যেখানে বিভিন্ন স্থানের লোকেরা প্রবেশ করে), এসকল স্থানে স্থান ও কালকে গনিমত মনে করে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব। আর এটি ইমাম আহমাদ, ইসহাক ও অন্যান্য ইমামদের (রাহিমাহুমুল্লাহ) মত।[৫২]

তবে, সবচেয়ে বেশি সম্ভাব্য (আল্লাহু আ'লামু) এবং সবচেয়ে উত্তম হল, তিনদিনের কমে কুরআন খতম না করা। কেননা উত্তম নির্দেশনা হল রাসুল ﷺ এর নির্দেশনা।

❁ সালাফদের সিয়াম

ইমাম বিন বাজ (রহ) বলেন,

"মুমিন মুমিনার জন্য শরিয়তসম্মত হল, ফায়দা অর্জন, ইলম হাসিল, অন্তরের একাগ্রতা এবং কালামুল্লাহ থেকে উপকার লাভের আশা করা। তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে তাদাব্বুর (চিন্তাভাবনা), তা'আক্কুল (বুঝতে পারা) এবং বেশি বেশি করা, শুধুমাত্র খতমের আশায় তিলাওয়াত না করা। উদ্দেশ্য হওয়া কালামুল্লাহ থেকে ইসতিফাদা (উপকার) এবং অন্তরের একাগ্রতা ও বিনম্রতা অর্জন করা; কুরআন অনুযায়ী আমল করে এবং যা তিলাওয়াত করা হয় তা অনুধাবনের মাধ্যমে অন্তর নরম করা। আর যদি কেউ কুরআন স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করে এবং তিনদিনে খতম করে অথবা পাঁচদিনে কিংবা সাতদিনে তাহলে কোন অসুবিধা নেই। তবে উত্তম হল, তিনদিনের কম সময়ে খতম না করা। প্রত্যেক দিন দশ পারা তিলাওয়াত করা যাতে করে তাদাব্বুর তথা চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করা যায়, যাতে তাআক্কুল তথা পুরোপুরি বুঝতে পারা যায়, তাড়াতাড়ি না হয়। আল্লাহ তাআলা সবাইকে তাওফিক দিন।"[৫৩]

তথ্যসূত্র:

৪০। লাতায়েফুল মাআরেফ: ৩১৮
৪১। লাতায়েফুল মাআরেফ: ৩১৮
৪২। সিয়ারু আ'লামিন নুবালা-লিযযাহাবি ২/৪/৪৩৯
৪৩। হাদিউস সারি ইবনু হাজার আসকালানি: ৪৮১
৪৪। প্রাগুক্ত, এবং তাহজিবুল আসমা ওয়াললুগাহ লিন-নববি: ১/৭৫, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা: ১২/৪/৪৪১
৪৫। লাতায়েফুল মাআরেফ: ৩১৮
৪৬। প্রাগুক্ত
৪৭। প্রাগুক্ত
৪৮। আত তিবয়ান ফি আদাবি হামালাতিল কুরআন: ৪৬
৪৯। প্রাগুক্ত
৫০। প্রাগুক্ত
৫১। [{আবু দাউদ: ১৩৯৪, তিরমিজি:২৯৫০, ইবনু মাজাহ: ১৩৯৭} আত তিবয়ান ফি আদাবি হামালাতিল কুরআন: ৪৬]
৫২। লাতায়েফুল মাআরেফ: ৩১৮
৫৩। শরহু সামাহাতিশ শাইখ আল্লামা আবদুল আজিজ বিন বাজ আলা কিতাবি ওয়াযাইফু রামাদান আবদির রাহমান বিন মুহাম্মাদ বিন কাসিম: ১৪০

৭। ইতিকাফ করা এবং সর্বদা মাসজিদে থাকা

রমাদ্বানের গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল হল, আল্লাহ তা'আলার ইত্বাআত করার জন্য সর্বদা মাসজিদে অবস্থান করা। এবং আল্লাহ তা'য়ালার সাথে মুনাজাত করা তথা একান্তে আলাপ করা। রাসুল ﷺ এর বিবি আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> "রাসূল ﷺ রমাদ্বানের শেষ দশকে আল্লাহ তা'য়ালা তার ওফাত দানের আগ পর্যন্ত ইতিকাফ করেছেন, এবং তারপর তার বিবিগণ ইতিকাফ করেছেন।"[৫৪]

আম্মাজান আয়িশা (রাঃ) হতে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি জিবরীল (আঃ) এর ব্যাপারে বলেন,

> নবি ﷺ এর উপর কুরআন প্রত্যেক বছর একবার পেশ করা হয়, কিন্তু যে বছর তাঁকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে সে বছর তাকে দুইবার পেশ করা হয়। প্রত্যেক বছর তিনি দশদিন ইতিকাফ করতেন, কিন্তু যে বছর তাকে উঠিয়ে নেওয়া হয় সে বছর তিনি বিশদিন ইতিকাফ করেন।[৫৫]

ইবনু হাজার আসকালানি (রহ) এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইরশাদ করেন, "বিশদিন দ্বারা উদ্দেশ্য মাঝের দশদিন ও শেষের দশদিন।"[৫৬]

তথ্যসূত্র:

৫৪। বুখারি: ২০২৬, মুসলিম: ১১৭২
৫৫। বুখারি: ৪৯৯৮
৫৬। ফাতহুল বারী: ৯/৪৬

Contents

৮। রমাদ্বানে মু'মিনের মুজাহাদা

ইবনু রজব (রহ) বলেন,

"জেনে রাখা উচিত, রমাদ্বান মাসে মুমিনগণ জমায়েত হয় অন্তরের দুইটি মুজাহাদার জন্য। এক, দিনে সিয়াম পালন, আর রাতে কিয়ামুল লাইলের দন্ডায়মান হওয়া। সুতরাং যে ব্যক্তি এই দুই জিহাদ ও মুজাহাদাকে একত্রিত করবে, এগুলোর হুকুম পুরিপূর্ণভাবে আদায় করবে এবং এ'দুয়ের উপর সবর করবে তাহলে তাকে অগণিত আজর (প্রতিদান) দেওয়া হবে।" (৫৬)

কুরআন এবং সিয়াম কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন,

> الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان
>
> "সিয়াম এবং কুরআন কিয়ামতের দিবসে বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। সিয়াম বলবে, হে রব! আমি তাকে দিনের বেলায় পানাহার এবং স্ত্রী সম্ভোগ হতে দূরে রেখেছি, সুতরাং আপনি তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। আর কুরআন বলবে, হে রব! আমি তাকে রাতে ঘুম থেকে দূরে রেখেছি, সুতরাং তার পক্ষে আমার সুপারিশ কবুল করুন। রাসুল ﷺ বলেন, তাদের উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে।"(৫৭)

আমি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তাঁর সুন্দরনামসমূহ ও সর্বোচ্চ গুণাবলীর দ্বারা প্রার্থণা করছি, তিনি যেন সকল মুসলিমকে প্রতিটি কল্যাণ কাজ এবং তিনি যাতে রাজিখুশি থাকেন তা করার তাওফীক দান করেন।

এবং নবী ﷺ এর অনুসরণ করার তাওফীক দান করেন, যেমনটি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা পছন্দ করেন।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর, তার পরিবারবর্গ ও সাহাবাগণের উপর এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর সকল অনুসারীদের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

আমীন।
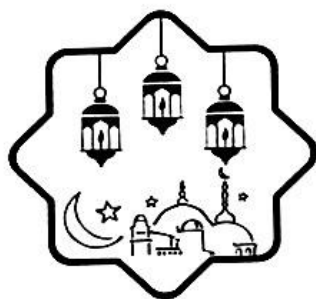
তথ্যসূত্র:

৫৬। লাতায়েফুল মাআরেফ: ৩১৮
৫৭। মুসনাদ আহমাদ: ৬৬২৬, হাকিম: ১/৫৫৪

সালাফদের সিয়াম

(২য় অংশ)

মূল: উম্মে আবদে মুনিব (উর্দু)
অনুবাদ: মুহিব্বুল্লাহ খন্দকার (গুফিরালাহু)
সম্পাদনা ও সংযোজন: রাজিব হাসান

শুরুর কথা

নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র, শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। আমরা তাঁরই সাহায্য চাই এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থণা করি। আমাদের নফসের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় চাই। আল্লাহ তাআলা যাকে হিদায়াত দেন তাকে পথচ্যুতকারী কেউ নেই। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে পথে ফিরাবার কেউ নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও প্রেরিত রাসুল। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন —

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞ্চা করে থাক এবং আত্নীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। [১]

অপর এক আয়াতের ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [২]

অন্য এক আয়াতের তিনি ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। (৩)

মহান আল্লাহ্ কুরআনুল কারীমের এই আয়াতগুলোতে তাকওয়ার বা অন্তরে আল্লাহর ভয়ের ব্যাপারে বলেছেন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি নির্দেশনা। যার অন্তরে আল্লাহর ভয় নেই তাঁর আসলে কোন ভয় নেই। যে তাকওয়ার দিক থেকে যত মিস্কিন তাঁর অবাধ্যতার পরিণাম তত বেশী। তাকওয়া বাড়ানোর উপায়ের মধ্যে সিয়াম একটি গুরুত্বপূর্ণ ঢাল।
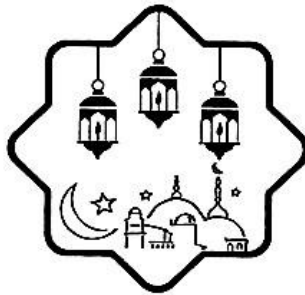
তথ্যসূত্র:

১। সুরা আন-নিসা, আয়াতঃ ১
২। সুরা আলে ইমরান: ১০২
৩। সুরা আহযাব: ৭০-৭১

লেখিকার আরজ

রমাদ্বানুল মুবারক সম্পর্কে অনেক বই, কিতাব ও পুস্তিকা ছাপা হয়েছে। প্রতি বছরই নতুন আঙ্গিকে ছাপা হয়ে থাকে। সবার কথা ভেবে আমিও শুরু করলাম এই নেক কাজে নিজেকে অংশীদার করতে। চাঁদ দেখা, সিয়ামের সংক্ষিপ্ত মাসায়েল, ইফতার, সাহরী, ইতিকাফ, মেয়েলি বিষয়, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, এবং নতুন নতুন স্বাস্থ্যগত বা ডাক্তারি মাসআলা - এগুলোর ব্যাপারে অনেক কিতাব লেখা হয়েছে। কিন্তু আমার অন্তরের খাহেশ ছিল, সলফে সালিহীন রমাদ্বান মাস কিভাবে কাটিয়েছেন, কিভাবে সিয়াম পালন করতেন, কিয়ামুল লাইলের কতোটা গুরুত্ব দিতেন তা সবার সামনে নিয়ে আসার। কেননা এই সম্মানিত তবকাই তো আমাদের রাহনুমা। পথ চলার পাথেয়। নিজেদের ইবাদত এবং আমলকে বিশুদ্ধভাবে সাজাতে হলে বারবার তাদের দিকেই ফিরে যেতে হবে। মহান আল্লাহ্ তাদের উপর রহম করুন। আমীন।

আলোচ্য সংক্ষিপ্ত এই বইটিতে সালাফদের যে বিষয়গুলো নিয়ে আসা হয়েছে তা বিশুদ্ধ উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। অবশ্য সালাফদের কিছু ঘটনার ব্যাপারে তাহকিক করা সম্ভব হয় নি। তবে আমি আশাবাদী ইন শা আল্লাহ ওগুলোও সহিহ হবে। আসল মাকসাদ হল আসলাফদের দৃষ্টান্ত সামনে রেখে নিজেদের আমলে ইখলাস বৃদ্ধি করা।

আল্লাহ যেন আমাদেরকে তাদের অনুসরণের মাঝে কামিয়াবি দান করেন এবং আমাদের রোজার মাস এবং রোজাও আল্লাহ তাআলার কাছে ওজনদার এবং মূল্যবান হয়।

কল্যাণকামী উম্মে আবদ মুনিব

রজব: ১৪৩৪ হিজরি

রমাদ্বানঃ বৈশিষ্ট্য ও তার মর্যাদা

রব্বে কারিমের ইরশাদ করেন,

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ

তিনি তোমাদের রব, তিনি যা চান সৃষ্টি করেন এবং যাকে চান মনোনীত করেন। তাদের মাঝে কারোরই কোন ইখতিয়ার নেই। (৪)

রমাদ্বান মাস ঐ পবিত্র মাস যাকে আল্লাহ তাআলা সকল মাস হতে মর্যাদাবান করেছেন। এই বরকতময় মাসকে কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ করার জন্য মনোনীত করেছেন। অবশ্য বছর জুড়ে আরও কিছু দিন বা আছে যেগুলোকে অন্যান্য সাধারণ দিনগুলোর তুলনায় ফজিলতপূর্ণ ও বরকতময় করা হয়েছে। যেমন, জুলহিজ্জা মাসের শেষ দশক, আইয়ামে তাশরিক, দুই ঈদের দিন, আশুরার দিন এবং হারাম মাসগুলো। কিন্তু রমাদ্বান মাসের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য হল এটি পূর্ণ এক মাসের ইবাদতের মাস। এ মাসের বৈশিষ্ট্যাবলী ও মর্যাদার দিকে দৃষ্টিপাত করলে নিম্নলিখিত শিরোনামগুলো হিরের মত ঝলমল করতে থাকে —

- এই মুবারক মাসে কুরআনে হাকিম নাজিলের সূচনা ঘটে —

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

রমাদ্বান মাস হল সেই মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হিদায়াত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট

পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (৫)

- এ পবিত্র ও বরকতময় মাসে লাইলাতুল কদরে লওহে মাহফুজ থেকে আসমান এর উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়।

  ইরশাদ হয়: إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

  আমি একে নাযিল করেছি শবে-কদরে। (৬)

- এটা তো ঐ পবিত্র মাস যে মাসে ঈমানের হালতে, সাওয়াবের আশায় রোজা রাখা হলে পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়।(৭)

- এটা ঐ বরকতময় মাস যাতে শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়।(৮)

- এটা ঐ আলোকিত মাস যে মাসে জাহান্নামের দরজাগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হয় আর জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়।(৯)

- এটা ঐ সম্মানিত মাস যাতে রোজাদারকে রব্বে কায়েনাত দুই খুশি দান করেন। এক, ইফতারের সময়; দুই, রব্বুল ইযযতের সামনে হাজির হওয়ার সময়।(১০)

❋ সালাফদের সিয়াম

- এই মাসের মধ্যে এমন একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাস হতে অধিক মর্যাদাপূর্ণ।

  ইরশাদ হচ্ছে - لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

  শবে-ক্বদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (১১)

- এটা ঐ প্রিয় মাস যাতে রোজাদারদের মুখের দুর্গন্ধ রব্বে কারিমের কাছে মেশক আম্বর ও কস্তুরি হতে অধিক পছন্দনীয়।(১২)

- এটা ঐ বরকতময় মাস যে মাসে উমরাহ করলে হজের বরাবর সাওয়াব হাসিল হয়।(১৩)

- এই পবিত্র মাসে সিয়াম পালনকারীর জন্য তাঁর সিয়াম জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচার জন্য ঢাল হয়ে যায় এবং রোজাদারকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচানোর মাধ্যম হয়ে যায়।(১৪)

- এটা ইবাদতের সেই মাস যে মাসে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নৈকট্য হাসিল করার জন্য দুনিয়া ও দুনিয়ার অন্যান্য ব্যস্ততা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে মাসজিদে ই'তিকাফ করা হয়। যার ফজিলত অন্যান্য সাধারণ দিনে ইতিকাফ করার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি।(১৫)

- রমজান ঐ সম্মানিত মাস যে মাসে আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ সা: জিবরীল (আঃ) এর সাথে মিলে কুরআনে কারিমে দাওর [একে অপরকে তিলাওয়াত করে শোনানো] দিতেন।(১৬)

- রমজান ঐ আলোকিত মাস যার আলোকিত রাতে আল্লাহর বান্দারা একসাথে মিলে কিয়ামুল লাইল তথা তারাবীর সলাত আদায় করে থাকে।(১৭)

- রমজান ঐ কল্যাণময় মাস যাতে নবী করিম ﷺ দান করার ক্ষেত্রে অন্যান্য সাধারণ মাসের তুলনায় কয়েকগুণ বেড়ে যেত। আনাস (রা.) বলেছেন, 'আমি নবী করিম ﷺ-এর চেয়ে কাউকে অধিকতর দয়ালু দেখিনি।'[১৮]

এরকমভাবে কুরআন ও হাদীসের আলোকে রমাদ্বানের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেক। অন্য যে কোন মাসের চেয়ে বহুলাংশে বেশী।

আমাদের সম্মানিত সালাফগণ ভাগ্য, কল্যাণ, ইজ্জত ও ইহতিরামে ভরপুর এই মাসে সকল প্রকার আমলে সালেহ করে কাটাতেন। এই বরকতময় মেহমানকে প্রফুল্লতা ও উদ্যমের সাথে স্বাগত জানাতেন।

চলুন আমরা পিছনে ফিরে যাই। সামান্য পিছনে ফিরে দেখি। সোনালি যুগের মানুষেরা কিভাবে রমাদ্বান মাস কাটিয়েছেন। সে দিকে একটু নজর দেই। নিজেরাও রমাদ্বানের প্রতিটি মুহূর্তকে তাকওয়া, সবর ও শোকর দ্বারা ভরপুর করে এ মাসটিকে কাজে লাগাই। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

✤ আসলাফ দ্বারা কাদেরকে উদ্দেশ্য?

আসলাফ হল সালাফ' এর বহুবচন। যার অর্থ হল, প্রথম। আর আসলাফ দ্বারা উদ্দেশ্য পূর্বেকার নেককার মানুষগণ।

ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় আসলাফ দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তিবর্গ উদ্দেশ্য যাদের যুগ নবি কারিম ﷺ এর যুগের নিকটবর্তী যুগ। উদাহরণসরূপ সাহাবায়ে কিরাম, তাবেইনে ইযাম, তাবে-তাবেইন।

> নবী আকরাম ﷺ এই তিন যুগের ব্যাপারে ইরশাদ করেন —
> "আমার উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম আমার প্রজন্ম। এরপর তৎসংলগ্ন প্রজন্ম (তাবেইনদের প্রজন্ম)। তারপর তৎসংলগ্ন প্রজন্ম (তাবে-তাবেইনর প্রজন্ম)।"[১৯]

❁ সালাফদের সিয়াম

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর এই হাদিস মোতাবেক সাহাবায়ে কিরাম, তাবেইন ও তাবে তাবেইন এই তিন শ্রেনীর মানুষ খায়রুল কুরুনের আলোকোজ্জ্বল ঝর্ণাধারা ও কেন্দ্রবিন্দু।

তাদের মধ্যে প্রথম হল সাহাবায়ে কিরামের যুগ, যাদের ব্যাপারে নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন —

> فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
>
> তোমাদের জন্য আবশ্যক হল আমার সুন্নত ও আমার খোলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নতকে মজবুতভাবে, দাঁতের দ্বারা আঁকড়ে ধরা এবং নতুন নতুন আবিষ্কৃত বিষয় ও কাজ হতে বাঁচা। কেননা দ্বীনের মাঝে প্রত্যেক নব আবিষ্কৃত বিষয় ও কাজ বিদআত আর প্রত্যেক বিদআত গোমরাহি তথা পথভ্রষ্টতা।[২০]

কুরআন ও সুন্নতের ওপর আমল করার ক্ষেত্রে এই তিন যুগের ব্যক্তিগণ ইসলামের প্রথম সারিতে ছিলেন এবং তাঁরাই আমাদের জন্য রাহনুমা। এই মহান ব্যক্তিগণ হলেন তারা যাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলামিন রিসালাতের সূর্য দ্বারা সঠিক পথ দেখিয়েছেন এবং নিকটবর্তী মাধ্যম দ্বারা তাদেরকে তার রহমত দান করেছেন। দ্বিনের সঠিক বুঝ দান করেছেন।

এই তিন যুগের মানুষের দ্বীনের বুঝ ছিল স্বচ্ছ ও নির্ভেজাল। আসলাফদের ইলম অর্জনের ও দ্বীন পালনের চেষ্টা ও কোশেশ এতটাই খাঁটি ছিল যে, যেখানে বিদআত, খাহেশাত এবং বাতিল ও ভ্রান্ত-আকিদার ধুলোবালি লাগেনি। দ্বীনের প্রতি তাদের মুহব্বত, কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী দ্বীনের বুঝ, ত্যাগ-তিতিক্ষা, আমল, যুহদ, আল্লাহভীতি এতটাই প্রবল ও খাঁটি ছিল যে সেখানে একফোঁটা পানিও ঢুকতে দেননি তাঁরা।

খায়রুল কুরুনের পর সে সকল লোক যারা তাদের জীবনকে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেইনদের রঙে রাঙিয়েছেন, ইবাদত ও মুআমালাতের ক্ষেত্রে কুরআন ও

সুন্নাহকেই সামনে রেখেছেন, দুনিয়া থেকে দূরে থাকা ও আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে আসলাফদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন - এই সকল ব্যক্তিদেরকে সালাফে সালিহিন নামে স্মরণ করা হয়ে থাকে।

উনাদের শত শত আমলের মাঝে আমরা আলোচ্য বইটিতে দেখব, রমাদ্বান মাস আসলে উনারা কী করতেন? কিভাবে কাটত তাদের সিয়াম পালন, রমাদ্বান উদযাপন। কতটা গুরুত্বের সাথে এই মহান মাসের সাথে উনারা নিজেদেরকে জড়িয়ে রেখেছেন।

তথ্যসূত্র:

৪। সুরা কাসাস, আয়াতঃ ৬৮
৫। সুরা বাকারা, আয়াতঃ ১৮৫
৬। সুরা কদর, আয়াতঃ ১
৭। সহীহ বুখারি: ৩০১৪
৮। বুখারি: ৩২৭, মুসলিম: ১০৭৯
৯। সহিহ মুসলিম, হাদিস নং: ২৩৬৬
১০। বুখারি ১৯০৪, মুসলিম: ১১৫১
১১। সুরা কদর, আয়াতঃ ৩
১২। সহীহ বুখারি: ১৮০৫
১৩। বুখারি: ৭২৮, মুসলিম: ১৩৫৬, ইবনে মাজাহ: ২৯৯২
১৪। বুখারি: ১৮৯৩
১৫। বুখারী ও মুসলিম।
১৬। সহিহ বুখারি, হাদিস নং: ১৯০২
১৭। মুআত্তা ইমাম মালিক, প্রথম খণ্ড, ১১০ পৃষ্ঠা, হাদিস: ২৮
১৮। সহীহ মুসলিম
১৯। বুখারি: ৩৬৫০, মুসলিম।
২০। আবু দাউদ: ৪৬০৭

অপেক্ষার প্রহর

সাহাবায়ে কিরাম এবং সালাফে সালিহিনগণ রমাদ্বানের গুরুত্ব ও ফজিলত পুরোপুরি মনে প্রাণে ধারণ করতেন। সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইতেন না। কুরআনুল কারিম ও নবীজি ﷺ এর হাদিসগুলোকে উনারা শুনতেন, বারবার পড়তেন। সাহাবায় আজমাইন (রাঃ) তো কাজেকর্মে রিসালাতের যুগে রমাদ্বানের আলোকিত রাতগুলো এবং আলোকিত ভোরগুলোকে নিজ চোখে দেখছেন।

আমাদের আসলাফগণ মাগফিরাতের এই মাসের ঠিক সেইভাবে অপেক্ষা করতেন যেভাবে একজন নববধূ তার স্বামীর জন্য অপেক্ষা করে থাকে। কোন কোন আসলাফ রমাদ্বান আসার ছয়মাস আগে থেকেই দুআ করতেন, আল্লাহ তায়ালা যেন তাদেরকে রমাদ্বান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন। আবার রমাদ্বান চলে যাবার পর দুআ করেতেন, আল্লাহ তায়ালা যেন রমাদ্বানে কৃত আমলগুলোকে কবুল করে নেন।[২১]

আসলাফগণ অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম, তাবেইন এবং তাবে-তাবেইনগণ পুরো বৎসরই রমাদ্বানের রহমত ও বরকত দ্বারা ফায়দা হাসিল করতে এতটাই মরিয়া ছিলেন। কখনও তারা রমাদ্বানের আগমনের কারণে খুশিমনে এর আদব বজায় রেখে, সম্মানের সাথে এর তাকাযা পূরণ করতেন আবার কখনও রমাদ্বান চলে যাওয়ার কারণে কৃত আমল ও সুলুক থেকে আহরিত সুবাসগুলোকে স্থিতিশীল ও অব্যাহত রাখার চেষ্টায় রত থাকতেন। রমাদ্বানের শিক্ষাই তো এটা। নিজেকে পরিশুদ্ধি এবং তাঁর উপরেই অটল থাকা।

সম্মানিত সালাফগণ নবী ﷺ এর অনুসরণ ও অনুকরণের মাঝেই আসল মজা পেতেন। নবীজি ﷺ নিজেও রজব ও শাবান মাসে রমাদ্বান মাসের অপেক্ষায় মগ্ন হয়ে যেতেন। রমাদ্বান মুবারকের সুক্ষ্মতা ও তার অবস্থাকে অনুভব করার জন্য প্রায় পুরো শাবান মাস রোজা রেখে কাটিয়ে দিতেন।

উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করেছিলেন,

> হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে শাবান মাসে যে পরিমান সিয়াম পালন করতে দেখি অন্য মাসে তা দেখি না। এর কারণ কী? তিনি ﷺ বললেন,

"রজব এবং রামাদ্বানের মধ্যবর্তী এ মাসটি সম্পর্কে মানুষ উদাসীন থাকে অথচ এটি এতো গুরুত্বপূর্ণ মাস যে, এ মাসে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে মানুষের আমলসমূহ উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি চাই সিয়াম অবস্থায় আমার আমল উঠানো হোক।[২২]

আম্মাজান হযরত আ'ইশা সিদ্দিকা (রাঃ) শাবানে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আমলের ব্যাপারে বলেন,

"রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট সিয়াম পালনের জন্য শাবান মাস অন্য মাসের তুলনায় বেশি প্রিয় ছিল। অতঃপর তিনি এই মাসে এতো সিয়াম পালন করতে যে, এটিকে রমাদ্বানে সাথে মিলিয়ে দিতেন। [২৩]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আ'ইশা (রাঃ) বলেন,

রাসূল ﷺ যখন (নফল) সিয়াম রাখতে শুরু করতেন তখন আমরা বলতাম, তিনি সিয়াম রাখা আর বাদ দিবেন না। আবার যখন সিয়াম বাদ দিতেন তখন আমরা বলতাম, তিনি আর সিয়াম করবেন না। তবে তাঁকে রমাদ্বান ছাড়া পরিপূর্ণভাবে অন্য কোন মাসে সিয়াম রাখতে দেখিনি এবং শাবান মাসের চেয়ে অন্য কোন মাসে এত বেশি সিয়াম রাখতে দেখিনি।"[২৪]

তবে উম্মতের জন্য নবীজি ﷺ এর দয়া ও করুণা ছিল বিধায়, শাবান মাসের শেষের দিকে তিনি বিরতি দিতেন। অর্থ্যাৎ শাবানের প্রথমদিকে সিয়াম পালন করতেন আর শেষের দিকে ছেড়ে দিতেন। অন্যথায় সালাফে সালিহিন এবং সাধারণ মুসলমান শাবানকে রমাদ্বান বানিয়ে ফেলতেন।

অতঃপর রমাদ্বানুল মুবারকের আগমনে এতটাই খুশি ও আমেজ ছড়িয়ে পড়ত যে, চাঁদ দেখার জন্য সাহাবায়ে কিরাম ও সালাফে সালিহিনগণ পাহাড়ের দিকে ছুটে দৌঁড়াতেন। খোলা ময়দানেও চাঁদ দেখার জন্য একত্রিত হতেন। চাঁদ দেখে সাহাবায়ে কিরাম ও আমাদের সালাফগণের ঠোঁটে দুআ এসে যেত, যে দুআ নবীজি ﷺ নতুন চাঁদ দেখার সময় পাঠ করতেন।

আর সে দুআ আটি ছিল —

اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله

উচ্চারণ: *আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিল-য়ুমনি ওয়াল ঈমানি, ওয়াসসালামাতি ওয়াল ইসলামি- রাব্বি ওয়া রাব্বুকাল্লাহ।*

অর্থ: হে আল্লাহ! চাঁদকে আমাদের জন্য শান্তি ও ইমান, সালামত ও ইসলামের সুরতে উদিত করুন। হে চাঁদ! তোমার আর আমার রব আল্লাহ, এই চাঁদ কল্যাণ ও হিদায়াতের।[২৫]

শুধু তাই নয়, রিসালাতের আলো ﷺ চাঁদ দেখার পদ্ধতিও বাতলে দিয়েছে। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবীজি ﷺ চাঁদ দেখার জন্য চাঁদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকাকে অপছন্দ করতেন আর বলতেন, চাঁদ দেখে ফেলেছ এবার স্ব স্ব রাস্তা দেখো আর দুআ করতে থাকো।

ইমাম ইবন শায়বা (রহ) বলেন, যখন চাঁদ দেখ তখন চাঁদের দিকে মুখ উঠাবে না। বরং দেখার পর এতটুকু বলে দেওয়াই যথেষ্ট তোমার রব ও আমার রব আল্লাহ।[২৭]

উল্লেখ্য, যখন নতুন চাঁদ দেখা যেত তখন চন্দ্রপূজারীরা চাঁদের সামনে দাঁড়াত এবং তার সিজদা করত। আমাদের সালাফগণ এই বিষয়ের যথেষ্ঠ সতর্কতা অবলম্বন করতেন যাতে করে আহলে শিরক ও কুফরের সাথে সামঞ্জস্য না হয়ে যায়।

কেননা, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন,
যে ব্যক্তি কোন কওমের সাথে সামঞ্জস্য রাখল যে ঐ কওমের অন্তর্ভুক্ত।[২৮]

তথ্যসূত্র:

২১। লাতায়েফুল মাআরেফ
২২। মুসনাদ আহমাদ ৫ম খন্ড ২০১ পৃষ্ঠা। সুনান নাসাঈ, কিতাবুস সিয়াম।
২৩। আবু দাউদ, কিতাবুস সিয়াম: ২৪৩
২৪। বুখারী, কিতাবুস সাওম। মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম।
২৫। তিরমিজি: ৩৪৫১, আবু দাউদ: ৫০৯২]
২৬। তিরমিজি: ৩৬১৫, হাকিম: ৪/২৭৫, আহমদ: ১/১৬৩
২৭। মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা
২৮। আবু দাউদ: ৪০৩১

মুবারাক হো মাহে রমাদ্বান

কুরআনুল কারিমের রমাদ্বান মাসে নাজিল হওয়াতে এর মর্যাদা ও সম্মান অনেক গুণ উঁচুতে পৌঁছে গেছে। আল কুরআন – মানবজাতির পথের দিশা, আঁধারের আলো ও মানজিলে মাকসুদে পৌঁছার প্রদীপ, দয়াময়ের কালাম এবং বান্দার সাথে তাঁর রবের বার্তালাপের পবিত্র মাধ্যম। মুসলিমের দৃষ্টিতে সেই পাত্র, কাগজ, গিলাফ ও রিহালও সম্মানের বস্তু এবং চোখের শীতলতা যার মাঝে মুসহাফকে রাখা হয়। তাদের কাছে পবিত্র রমাদ্বান মাসের সম্মানও ঢের বেশী যে মাসে কুরআনুল কারিমকে নাজিল করা হয়েছে। রব্বে করিম সিয়ামকে ফরজ করে এই মাসের আদব ও সম্মানকে আলাদাভাবে সংরক্ষণ করেছেন। সিয়াম পালনের সাথে কুরআনুল হাকিমের সম্পৃক্ততার কারণে এ মাসের নিম্নবর্ণিত দাবি রয়েছে —

— এর আগমনে খুশি প্রকাশ করা।

— সিয়াম, কিয়ামুল লাইল, কুরআন তিলাওয়াত, জিকর-আজকারের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া।

— বেশী বেশী নেকি অর্জন করা এবং প্রত্যেক গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া।

— মুসলিম ভাইবোনদেরকে নিজের উপর প্রাধান্য দেওয়া ও উদারতা দেখানো।

— সিয়াম অবস্থায় শাহওয়াত ও প্রবৃত্তি হতে বাঁচা।

এছাড়াও রমাদ্বানুল মুবারকের সম্মানের সবচেয়ে বড় বাহ্যিক দিক হল, যার উপর কোন শরয়ি ওজর থাকে তাকেও প্রকাশ্যে খাবার গ্রহণে বাধা দেওয়া। যেমন, রোগী, শিশু এবং গর্ভবতী ইত্যাদি। এমন লোকদের যদি খাবার গ্রহণের প্রয়োজন হয় তাহলে অন্যান্য লোকদের থেকে আড়ালে গিয়ে গ্রহণ করবে। সাহাবায়ে কিরামগণ রমাদ্বানের ইহতিরাম করা এবং দিনের বেলায় খানাপিনা থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে এতটাই গুরুত্ব দিতেন যে, তাদের সাথে সাথে বাচ্চাদেরকেও রোজা রাখতে আদেশ দিতেন।

❁ সালাফদের সিয়াম

সাইয়িদা রুবাই বিনতু মুআওয়িজ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন,

"আমরা বাচ্চাদেরকেও রোজা রাখাতাম এবং তাদেরকে পশমের খেলনা তৈরি করে দিতাম। তাদের কেউ খাবারের জন্য কাঁদলে খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম। আর এভাবেই ইফতারের সময় এসে যেত।[২৯]

বাচ্চারা যদিও ফারায়েজসমূহ আদায় করার ওপর আদিষ্ট নয় তবুও তাদেরকে বাল্যকাল থেকেই ফারায়েজসমূহ আদায় করার অভ্যাস করানো উচিত।

সাইয়িদুনা আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর খেদমতে আরজ করলাম, আমাকে এমন কোন আমলের কথা বলে দিন যার বদৌলতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের ওপর আবশ্যক হল, সিয়ামকে আঁকড়ে ধরা। কেননা এর মত কোন আমল নেই। এরপর আবু উমামা (রাঃ) এর ঘরে দিনেরবেলায় ধোঁয়া দেখা যেত না। তবে যদি তার ঘরে মেহমান এসে যেত।[৩০]

উল্লেখ্য, মেহমানের উপর সিয়াম পালন ফরজ না। তার ব্যাপারে অনুমতি আছে যে, সে রমাদ্বানে সফরের হালতে সিয়াম ছেড়ে দিবে এবং পরবর্তীতে সংখ্যানুপাতে তা পুরো করে নিবে। কিন্তু সে জনসম্মুখে খানাপিনা করবে না। এর ইজাজত নেই। এমতবস্থায় যদি কোন মেহমান এসে যায়, এবং সে সিয়াম পালন না করে থাকে, তাহলে মেজবানের উচিত কিছু রান্না করা থাকলে তাকে খাওয়ানো। অবশ্য যদি রান্না করা না থাকে তাহলে রান্না করাটা কষ্টের।

আজকাল আমাদের সমাজে লক্ষ্য করলে দেখা যায় বাচ্চারা কিংবা অন্যান্য ওজরওয়ালা লোকেরা জনসম্মুখেই খানাপিনা করে থাকে। দোকানপাট খোলা থাকে, হোটেলগুলোতেও খাবার দাবারের ব্যবস্থা জারি রাখা হয়। রমাদ্বানে জনসম্মুখে খানাপিনা পরিহার করা আবশ্যক কেন? এর মাঝে কি হিকমাহ লুকিয়ে থাকতে পারে?

✤ নিম্নবর্ণিত হিকমাহ নিহিত আছে —

- রমাদ্বানে সিয়াম পালন করা এবং খানাপিনা থেকে বিরত থাকার বৈশিষ্ট্য এই মাসকে অন্যান্য মাস থেকে পৃথক করে দেয়। যদি এট বজায় না রাখা হয় তাহলে তো রমাদ্বানে অনন্যতা ও মর্যাদাই খতম হয়ে যায়।

- প্রকাশ্যে খাওয়া দাওয়া পরহার করে মুসলিম সমাজে এটা প্রতিষ্ঠিত করা যে, আমি মুসলিম আর এই মাস আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন করে সিয়াম সাধনা করার মাস।

- যদি রমাদ্বানে দোকান পাট খোলা রাখা হয়, শিশু বাচ্চা ও মাজুর ব্যক্তি মানুষের সামনে প্রকাশ্যে খাবার খায় তাহলে দুর্বলদের মনে উৎসাহ এসে যাবে যে, সিয়ামের অতোটা গুরুত্ব নেই। সবাই খাচ্ছে। কাজেই, সিয়াম পালনের দরকার নেই।

- যারা বাস্তবিকপক্ষেই মাজুর, সিয়াম পালনে অক্ষম — তাদের নিদেনপক্ষে জনসম্মুখে খানাপিনা পরিহার করে সিয়াম পালনকারীদের সাথে আত্মীকভাবে সাদৃশ্যতা বজায় রাখা উচিৎ।

- রমজানুল মুবারক সার্বিকভাবে মুসলমাজাতির ইবাদত এবং এর পবিত্রতা রক্ষার মহত্ব দেওয়া হয়েছে এই জাতিকে। যে ব্যক্তি সিয়াম পালনে অক্ষম তার ব্যাপারেও জোর দেওয়া হয়েছে যে, সে-ও এই হুকুমকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সদা প্রস্তুত থাকবে। তাই সবার সামনে খাবার গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকে রমাদ্বানের অন্যান্য আহকাম ও আদব পালনে ব্রতী হবে। সিয়াম পালনে অক্ষম ব্যক্তিরা সলাত আদায়, কুরআন তিলাওয়াত, কিয়ামুল লাইল,বদান্যতা-উদারতা, দান সদাকা এবং অন্যান্য নেক আমলের প্রতি দরদী থাকবে। অন্যান্য সিয়াম পালনকারীদের মতো এই আমলগুলোর পাবন্দি করতে হবে।

❖ সালাফদের সিয়াম

- রমাদ্বানের সিয়াম একটি ইজতিমায়ি ইবাদত, যা সকলেই আদায় করে। এজন্য প্রত্যেক দারিদ্র, রোগী ও মাযুর ব্যক্তিকেও এই ইবাদত আদায় করার জন্য সাধ্যমত অংশ নিয়ে আল্লাহর কাছে প্রতিদান ও সুসংবাদ হাসিল করতে হবে।

- রমাদ্বানুল মুবারকের এই বৈশিষ্ট্য এবং অনন্য মর্যাদা মুসলিমদের কাছ থেকে দাবি করে যে, তারা রমাদ্বান মাসের এই ইজতিমায়ি ইবাদতের মাধ্যমে ইজতিমায়ি এবং রুহানি ফায়দাসমূহ দ্বারা নিজেদেরকে উপকৃত করতে পারে।

আমাদের সালাফগণ রমাদ্বানের সকল হুকুম-আহকাম ও আদবগুলোকে পালন করার ক্ষেত্রে অগ্রজ ভূমিকা পালন করতেন। প্রতিটি হুকুম ঠিকঠিকভাবে আদায় করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেন।

এ ব্যাপারে একটি হাদিসে এসেছে। সাইয়িদুনা আদি ইবনু হাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যখন —

حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود

অর্থাৎ, তোমরা পানাহার কর (রাত্রির) কালোরেখা হতে (ভোরের) সাদা রেখা যতক্ষণ স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়"

এই আয়াত নাজিল হয় তখন আমি একটি কালো এবং সাদা রশি নিলাম। এবং উভয়টিকে বালিশের নিচে রেখে দিলাম এবং রাতে আমি এগুলোর একটির দিকে বারবার দেখতে থাকলাম। কিন্তু আমার নিকট কোন রং প্রকাশিত হল না। সকাল হলে আমি আল্লাহর রাসুল ﷺ এর নিকট গিয়ে এ বিষয়ে বললাম। তিনি বললেন, তোমার বালিশ তো অনেক বড় যে, উভয় দিগন্তকে এক করে ফেলেছে। অতঃপর বললেন এর দ্বারা উদ্দেশ্য রাতের আঁধার এবং দিনের আলো। এমনিভাবে কিছু সাহাবায়ে কিরাম সাদা ও কালো রশি পায়ে বেঁধে নিতেন এবং দেখতেন যে দুটোর রং আলাদা আলাদা আসত কিনা?[৩১]

এই ছিল সাহাবায়ে কিরামের সিয়ামের ব্যাপারে সতর্কতার নমুনা। রাসূলে আকরাম ﷺ তাদেরকে সুন্দরভাবে খোলাসা করে দেওয়ার পর তাদের কাছে এর উদ্দেশ্য প্রতিভাত হয়।

এরপর থেকে সাহাবায়ে কিরাম এবং পরবর্তী সালাফগণও সাহরীর জন্য শুভ্র প্রভাতের প্রতি নজর রাখতেন এবং ইফতারের সময় দেখতেন, সূর্য ডুবে গিয়ে তার রক্তিম আভা কখন অদৃশ্য হয়ে যায়।

সিয়াম পালন করে নিজের ভিতরে দৈনতা অনুভব করা এই মহান ইবাদতের আদবের বরখেলাফ। মুসলিমের উচিৎ, তারা প্রত্যেক ইবাদতকে পরিপূর্ণ কর্মক্ষমতা, একাগ্রতা, প্রফুল্লতা ও প্রশান্তচিত্তে আদায় করবে। ইবাদতের কারণে তাদের চেহারায় হতাশার ছাপের বদলে যেন প্রাণবন্ত এক রূপ আসে। এমন যেন না হয় যে, সিয়াম পালনের কারণে তাঁর চেহারায় বিষণ্ণতার ছাপ লেগে আছে। বোঝা উচিৎ, সিয়াম আমাদের জন্য বোঝা নয় বরং রহমত। যার দুনিয়াবী আখিরাতমুখী কল্যাণ আছে।

আমাদের সালাফগণ এই বিষয়টির প্রতি বিষেশ গুরুত্বারোপ করতেন। এ কারণে সিয়ামাবস্থায় গোসল করা, চিরুণী লাগানো, চুলে তেল দেওয়া মিসওয়াক করা এবং আতর লাগানো সব জায়েয। যাতে মনের ভিতরে একটি প্রফুল্লভাব চলে আসে।

বর্তমান যুগে বেশির ভাগ মুসলিম সিয়াম পালন করে বিছানায় শুয়ে পড়ে থাকেন। তাঁরা মনে করে যে, সিয়াম পালনের কারণে সে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। কারো কারো তো মুখের দিকেই চাওয়া যায় না। কেউ কেউ তো বলেই বেড়ায় যে, আমার রোজা লেগে গেছে, রোজায় ধরেছে, পিপাসা লেগেছে, আজকে তো তারাবিহই পড়তে পারিনি, উফ! কত গরম। ঠান্ডা পানি দেখে পানি পান করতে মনে চাচ্ছে...ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঠিক একইভাবে ইফতারের সময় বেশিরভাগ মানুষ ইফাতারী নিয়ে পড়ে থাকে। কঠিনভাবে বলতে গেলে, আল্লাহর এক আনুগত্যশীল বান্দার মেজাজ বা অবস্থা এমনটি হওয়া উচিত নয়। ইফতারের সময় পুরো আল্লাহর শুকরিয়া ও প্রশান্তির সাথে ইফতারি গ্রহণ করা উচিত। বাড়াবাড়ি ও তাড়াহুড়া করা উচিৎ নয়।

❁ সালাফদের সিয়াম

জামাআত দাঁড়িয়ে যাবার পরেও মাসজিদের দিকে দৌঁড়ে গিয়ে জামাআতে শামিল হওয়াকে নিষেধ করা হয়েছে। যদি ইবাদতের মাঝেও হাঙ্গামা, তরাপ্রবণতা, মারামারি, আমি আগে ও আমারটা আগে এমন বিষয় শামিল হয়ে যায় তাহলে সে ইবাদত আর ইবাদত থাকে না।
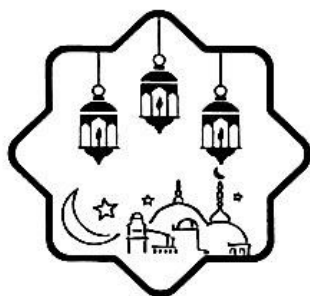
তথ্যসূত্র:

২৯। সহিহ বুখারি: ১৯৬০
৩০। ইবনু হিব্বান: ৯২৯, হাকিম: ১/৪২১
৩১। বুখারি: ১৯১৬ (শামেলা ভার্সন)

সালাফদের গ্রীষ্মকালীন এবং সফরকালীন সিয়াম

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা চন্দ্র-সূর্যের বিবর্তন এমন এক নিয়মে সাজিয়েছেন যে, কোন এলাকায় কখনও রাত লম্বা হয়, কখনও বা দিন লম্বা হয়। লম্বা দিনে গরমের মৌসুমে সিয়াম সাধনা খানিকটা কঠিন হয়ে যায়। পৃথিবীর কোনো অংশতো এমনও রয়েছে যেখানে প্রচন্ড গরম থাকে এবং ২১-২২ ঘন্টা দিন থাকে। তারপরেও মুসলিমজাতি অত্যন্ত আদব, ইখলাস এবং হিম্মতের সাথে সিয়াম পূর্ণ করে থাকে। ফালিল্লাহিল হামদ।

সাহাবায়ে কিরাম, তাবেইন, তাবে-তাবেইন তথা সলফে সলেহিনগণ তীব্র গরমের সিয়ামকেও অত্যন্ত মুহাব্বতের সাথে পালন করতেন। দিন যত লম্বা হয়, গরম তত বেশি লাগে। কাজেই সালাফগণ দীর্ঘক্ষণ সিয়াম পালন করে কুরআন তিলাওয়াত করার ফুরসত বেশি পেতেন। কুরআন তিলাওয়াতের সময় তাদের চোখের সামনে জাহান্নামের ভয়াবহ আগুনের চিত্র ভেসে উঠত। কাজিএ দুনিয়াবী গরম তাদেরকে ভোগাতে পারত না। কালামে পাক তিলাওয়াত করার সময় তাদের অবস্থা এমন হত যে, জাহান্নামবাসীর চিৎকার তারা শুনতে পাচ্ছেন। জাহান্নামবাসী পিত্ত, রক্ত এবং পূজমিশ্রিত পানি পান করছে সেগুলোও তাঁরা দেখতে পাচ্ছে। তিলাওয়াত করতে করতে জাহান্নামের ভয়ে তাদের দম বন্ধ হয়ে আস্ত। জাহান্নামের ভয়ে তো কেউ কেউ হাসি-মশকরা ছেড়ে দিয়েছিল। কেউ কেউ আবার আতংকে বিছানায় খুব কষ্টে পিঠ ঠেকাতেন। কেউ কেউ শুধু জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবার আশায় ভুখাদেরকে খানা খাওয়াতেন নাঙ্গাদেরকে কাপড় পরাতেন, দাসদাসীদের আজাদ করে দিতেন। অবশ্যই তারা নবীজি ﷺ এর হাদিসের উপর পরিপূর্ণ ইয়াকিন হাসিল করেছিলেন।

> রাসুলে আকরাম ﷺ ইরশাদ করেন,
> "রোজা হলো ঢাল ও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার মজবুত দুর্গ।"[৩২]

অপর হাদীসে এসেছে, রোজা আগুন হতে বাঁচার জন্য ঢাল। যেমন তোমাদের মাঝে কোন ব্যক্তির ঢাল যুদ্ধে বাঁচায়। [৩৩]

❃ সালাফদের সিয়াম

আমাদের সালাফরা জানতেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার কাছে সিয়াম পালন অত্যন্ত প্রিয় একটি আমল। হাদিসে কুদসিতে এসেছে,

> প্রত্যেক আমলই বান্দার জন্য, সিয়াম ব্যতীত। কেননা সিয়াম আমার জন্য, আর আমিই এর প্রতিদান দেব। সে আমার জন্যই খাদ্য ও পানীয় এবং শাহওয়াত থেকে দূরে থাকে।(৩৪)

এ ব্যাপারে আরেক হাদিসে এসেছে —

> حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه
>
> আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, রোজা ব্যতীত আদম সন্তানের প্রতিটি আমলই তার নিজের জন্য। কিন্তু রোজা আমার জন্য। তাই আমি এর প্রতিদান দেব। রোজা ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ যেন রোজা পালনের দিন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে ঝগড়া করে তাহলে সে যেন বলে, আমি একজন রোজাদার। যার কবজায় মুহাম্মদের প্রাণ তার শপথ! অবশ্যই রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের গন্ধের চাইতেও সুগন্ধি। রোজাদারের জন্য রয়েছে দুটি খুশি যা তাকে খুশি করে। যখন সে ইফতার করে, সে খুশি হয় এবং যখন সে তাঁর রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন রোজার বিনিময়ে আনন্দিত হবে।(৩৫)

রোজাদার ব্যক্তির ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট ম্লান হয়ে যায় মালিকের কাছ থেকে এমন প্রতিদানের প্রতিশ্রুতির জন্য। তাই তো ইফতারির সময় পানি দ্বারা

Contents

শরীর ঠান্ডা করে নবীজি ﷺ আল্লাহর কাছে আশা ব্যক্ত করে আদবের সুরে বলে উঠতেন যে,

« ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ »

উচ্চারণ: যাহাবায যামাউ, ওয়াব তাল্লাতিল উরুক্বু ও ছাবাতাল আজরু ইন শা আল্লাহ্।

অর্থ: পিপাসা দূরীভূত হয়েছে, শিরা-উপশিরাগুলো সিক্ত হয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ প্রতিদানও নির্ধারিত হয়েছে।[৩৬]

এই সকল শব্দের বুনন দিয়ে নবীজি ﷺ রবের শুকরিয়া ও সবর আদায় করতেন এবং আশপাশে উপস্থিত ফিরিশতা এবং মানুষদেরকে এই আনন্দ ও খুশি প্রকাশ করে সাক্ষী বানিয়ে রাখতেন।

সালাফগণ জানতেন, রোজা রেখে পিপাসা সহ্য করে যদি জান্নাতের রাইয়ান নাম দরজা দিয়ে প্রবেশ করার ইজাজত মিলে যায় তাহলে তো এটা অনেক বড় মুনাফার সওদা।

সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) তো সেই সৌভাগ্যের যুগও দেখেছেন যখন দ্বিতীয় হিজরিতে রোজা ফরজ হওয়ার সময় গ্রীষ্মকালীন মওসুম ছিল। মক্কা মুকাররমা দশ হিজরির রমাদ্বানুল মুবারকে বিজিত হয়। তখন প্রচন্ড গরম ছিল। আরবের ঝলসে দেওয়া মরুভূমি এবং ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেড়া পাথুরে ও গরমে ঝলসে দেওয়া ভূমির সফর সম্মুখে ছিল। রাস্তায় কোন ছায়া ছিল না বললেই চলে। এতদসত্ত্বেও সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম সিয়ামবস্থায় দুশমনদের মোকাবেলা করতে ঘর থেকে যুদ্ধের জন্য বের হয়েছিলেন। যখন নবিজি ﷺ কাদিদ নামক স্থানে পৌঁছালেন তখন রোজা খুলে ফেললেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে হুকুম দিলেন রোজা খুলার জন্য।[৩৭]

তদুপরি সাহাবায়ে কিরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) জিহাদের সফরের সময় রোজা রাখার ব্যাপারে বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সাথে তীব্র গরমের মাঝে বের হলাম। এমনকি আমাদের মাঝে কেউ কেউ গরমের তীব্রতার কারণে হাত মাথায় রাখত। আমাদের মাঝে কেউ রোজাদার কেউ ছিল না রাসুলুল্লাহ ﷺ এবং আবদুল্লাহ ইবন (রাঃ) ব্যতীত।[৩৮]

❁ সালাফদের সিয়াম

সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রাঃ) বলেন, যারা জিহাদের ময়দানে সিয়ামাবস্থায় শাহাদাত বরণ করেছেন তাদেরকে গলায় লাগালেন। মুতার যুদ্ধে যখন যায়েদ বিন হারিসা (রাঃ) এবং জাফর তায়্যার (রাঃ) শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন তখন সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রাঃ) আমির নিযুক্ত হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে যার তাগিদ দিয়েছিলেন। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রাঃ) সেদিন সিয়ামরত ছিলেন। সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময় তিনি মনে করলেন ইফতার করে নেই যাতে শরীরে শক্তি আসে, অতঃপর ময়দানে ফিরে যাওয়া যায়। ইফতারিতে তার সামনে গোশতের টুকরা আনা হয়। তিনি গোশত খেতে যাবেন, তাতে কোন আগ্রহ জন্মাল না। আগ্রহ জন্মাবেই বা কিভাবে? ওদিকে শাহাদাতের ময়দান তো তাদেরকে ডাকছিল। অগ্রবর্তীগণ তো ইতিমধ্যে তাদের শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে ফেলেছেন। তলোয়ার খাপ থেকে বের করার সময় খাপকেই ভেঙ্গে ফেলেন তিনি। শত্রুদের সারির ভিতর ঢুকে বীরদর্পে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে করতে নিজের জীবনকে জীবনের মালিকের কাছে সোপর্দ করেন।[৩৯]

আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রাঃ) ও অন্যান্য বীর মুজাহিদ সাহাবা (রাঃ) আজমাঈন মনেপ্রাণে নবীজি ﷺ এর এই হাদীসটি হৃদয়ে ধারণ করতেন —

> "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে একদিন সিয়াম পালন করবে আল্লাহ তায়ালা তার এবং জাহান্নামের মাঝে আসমান ও জমিনের দূরত্বের এক খন্দক বানিয়ে দিবেন।[৪০]

ফরজ সিয়াম তো পালন করা হয় আবশ্যকীয় এই কারণে। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এবং সম্মানিত সালাফগণ তো গরম মৌসুমেও নফল সিয়াম পালন করতে পছন্দ করতেন।

সাইয়িদুনা আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর ব্যাপারে বলা হয় যে, তিনি গরমকালেও নফল সিয়াম রাখতেন এবং শীতকালে নফল সিয়াম রাখতেন না।[৪১]

আম্মাজান আ'য়িশা (রাঃ), তিনিও প্রচন্ড গরমে নফল সিয়াম পালন করতেন।[৪২]

আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রাঃ) নফল সিয়াম পালন করতেন। প্রচন্ড গরমের তাপে বেহুশ হয়ে যেতেন। তবুও রোজা ভাঙতেন না।[৪৩]

আবু দারদা (রাঃ) বলতেন, "কিয়ামতের দিনের কঠিন তাপ থেকে বাঁচার জন্য কঠিন গরমের দিনেও রোজা রাখো। কবরের আঁধারকে আলোকিত করার জন্য রাতের আঁধারে দুই রাকাআত নামাজ পড়ো।"[৪৪]

সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) গরমের দিনে সিয়াম পালনের আশা করতেন।

আমর বিন কায়স (রাঃ) একবার বসরা থেকে শামে গেলেন। মুআবিয়া (রাঃ) তখন সেখানকার খলিফা ছিলেন। শাম ছিল দারুল খিলাফা অর্থ্যাৎ রাজধানী। মুআবিয়া (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কোনকিছুর প্রয়োজন আছে কিনা, থাকলে আমাকে বলুন।"

তিনি বারবার তাঁর প্রয়োজনের ব্যাপারে জানতে চাইলেন। আমির বিন কায়স (রাঃ) প্রতিবারই তাঁর এই প্রস্তাবকে নাকচ করে দেন। তিনি বলেন, "আমার কোন কিছুর প্রয়োজন নেই।" অবশেষে মুআবিয়া (রাঃ) এর পীড়াপীড়িতে তিনি বলেন,

"আমাকে বসরার গরম আবহাওয়া ফিরিয়ে দিন। তাহলে হয়ত আমার সিয়াম পালন কঠিন হয়ে যাবে, আপনাদের শহরের রোজা অনেক হালকা।"[৪৫]

অথচ, আজকাল আমাদের সময়ে রমাদ্বান মাসে একটু গরম পড়লেই রোজাদারদের সংখ্যা কমে যায়। গরমের তীব্রতার কাছে জাহান্নামের আগুনের তীব্রতা কম মনে হয়। এজন্য হয়ত এ মাসের গরম সহ্য করতে পারেনা। বিত্তশালীরা তো এয়ারকন্ডিশন রুমে রমাদ্বানের দিনগুলো আরামসে পার করে দেয়। কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারের বেশির ভাগ লোকই এ কারণে রোজা রাখে না। আর রোজা রাখলেও, এমন একটা ভাব চোখেমুখে লেগে থাকে যে গরম তাদেরকে একদম শেষ করে দিয়েছে। হাপিত্যেশ করতে থাকে। গরমের দিনে সিয়াম পালন তাদের জন্য বিশাল এক সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার মত মনে হয়।

কিন্তু সিয়ামের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম ও সালাফগণের চিন্তা-চেতনা আমাদের চেয়ে একদম ভিন্ন ছিল। তারা শীতকালের সিয়ামকে হালকা মনে করতেন। আর গরমের দিনের সিয়ামকে কঠিন ও বেশি নেকী হাসিলের সুযোগ মনে করতেন। তাদের কাছে গরমকালের সিয়াম বেশি পছন্দনীয় ছিল।

❁ সালাফদের সিয়াম

আসলে সিয়াম হল আত্মিক বিষয়। ঈমানের বিষয়। দুনিয়ার সামান্য কষ্ট ভোগ করে আখিরাতের বড় কষ্ট থেকে নিজেকে মুক্ত করার বিষয়। রমাদ্বানে সালাফদেরকে গরম, ক্ষুধা ও পিপাসার মাঝেও বেশ প্রফুল্ল ও উজ্জীবিত দেখা যেত। তাদের উপরে বরকত, প্রশান্তি, আল্লাহর দয়া, অনুগ্রহ এবং তাওয়াজ্জুহ হাসিল হত।

তাদের ইমান ছিল আকাশছোঁয়া। আর আমাদের দুর্বল ইমানের কারণে সিয়াম পালন করা আজ আমাদের কাছে কষ্টকর হয়ে উঠেছে। এমনকি সিয়াম পালনের মাধ্যমে আল্লাহর ক্রোধ দমন, সন্তুষ্টি অর্জন, জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুন থেকে বাঁচার মত সুপ্ত ও মূল্যবান নিআমতগুলোকে আমরা অনুভব করতে পারি না।
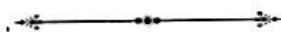
সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) সাথীদের সাথে কোন এক সফরে বের হলেন। রাস্তায় তার জন্য দস্তরখান বিছানো হল। এক রাখাল পথ দিয়ে যাচ্ছিল। ইবন উমর (রাঃ) তাকে ডাকলেন যাতে সেও তাদের সাথে খাবারে শরীক হতে পারে। রাখাল বলল, "আমি রোজাদার (নফল সিয়াম)।" ইবন উমর আশ্চার্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এই প্রচন্ড গরমে, উত্তপ্ত মরু উপত্যকায় ভেড়া-বকরির পালের পিছনে দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে তুমি রোজা কিভাবে রাখো?" রাখাল বলল, "আমি অতিবাহিত দিনগুলোর ব্যাপারে তাড়াহুড়া করছি" (অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেকে গনিমত মনে করে নেকি হাসিলের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করছি, মৃত্যু যেখানে অবশ্যম্ভাবী)। রাখালের এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) এর বিস্ময় আরো বেড়ে গেল। তিনি তাকে বললেন, "তোমার একটা বকরি আমাদের কাছে বিক্রি করে দাও, এর গোশত তোমাকেও খাওয়াবো, আর তুমি এই মাংসের দ্বারা তোমার রোজাও ভাঙতে পারবে (নফল সিয়াম ভাঙার অনুমতি আছে)। আর আমরা তোমাকে ঐ বকরির মূল্যও দিয়ে দিব।" এ প্রস্তাব শুনে রাখাল বলল, "এই বকরির পাল আমার নয়, আমার মালিকের। এটা আমার কাছে আমানত।"

তখন আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) তাকে পরীক্ষা করার জন্য বললেন, "তুমি তোমার মালিককে বলবে, ঐ একটা বকরিকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। এ কথা শুনে রাখাল চিৎকার দিয়ে আকাশের দিকে আঙ্গুল উঠিয়ে বলল, "তাহলে

আল্লাহ কোথায়।" (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা দেখছেন) ইবন উমর (রাঃ) তার এ কথায় প্রভাবিত হয়ে বারবার বলতে লাগলেন, "তাহলে আল্লাহ কোথায়।"

অতঃপর তিনি মদিনা মুনাওয়ারায় ফিরে এসে ঐ রাখালকে তার মালিকের কাছ থেকে কিনে নেন। রাখালের সাথে ঐ বকরির পালকেও তিনি কিনে নেন। অতঃপর তিনি তাঁকে আজাদ করে দেন এবং তাঁর সততায় মুগ্ধ হয়ে বকরিরগুলোকে পুরস্কার হিসেবে তাঁকে দিয়ে দেন।[৬৬]

আমাদের জন্য এই ঘটনায় চিন্তার খোঁড়াক রয়েছে। এরা হচ্ছে ঐ সকল লোক যারা মরুভূমির তীব্রে গরমের লম্বা দ্বিপ্রহরে পশু চড়াতো, কাজের তাগিদে প্রখর রোদ্রে চলাফেরা করতো, সাথে সাথে সিয়াম পালন করে আখিরাতের সামান হাসিল করতো। তারা দৈনন্দিন জীবনোপকরণের ফিকির করার পরও ইবাদতের ব্যাপারে উদাসীন হতো না। মহান আল্লাহর তাদের উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন, আমীন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, ঐ ব্যক্তির জন্য দিগুণ নেকি যে তার দুনিয়াবি মালিকের হক আদায় করে (তার আনুগত্য করে) এবং তার প্রকৃত মালিকের (তথা আল্লাহ তাআলার) হক আদায় করে তথা ইবাদত করে।[৬৭]

বনু উমাইয়া গোত্রের এক সরদার রাওহ বিন যামবা একবার উমরাহ করার জন্য সফর করেন। তার কাছে খানাপিনার জন্য পর্যাপ্ত খাবার মওজুদ ছিল। ফল-ফলাদি, বকরি ও মুরগির গোশতের কমতি ছিল না। এ কারণে তার দস্তরখান খাবার দাবারে ভরে যেত। তিনি তার দস্তরখান বিছিয়ে সাথে থাকা অন্যান্য লোকদেরকে তাঁর সাথে যোগ দিতে বললেন। এক গ্রাম্য বেদুইন তখন তাদের পাশ দিয়ে বকরি চড়াতে চড়াতে যাচ্ছিল। রাওহ বিন যামবা তাকে ডাকলেন। বললেন,

— "আসুন, খাবার গ্রহণ করুন।"

— "আপনার চেয়েও সম্মানিত ও প্রিয়জন আমাকে তাঁর দস্তরখানে খাবারের দাওয়াত দিয়েছেন।"

— "কে তিনি?"

❋ সালাফদের সিয়াম

— "সমগ্র জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ।"

— "আল্লাহ তায়ালা আপনাকে কীভাবে দাওয়াত দিলেন?" (অবাক হয়ে রাওহ বিন যামবা)

— "আমি রোজা রেখেছি আর অতি শীঘ্রই আমি ইফতার করব।"

— "আজকে রোজা ভেঙে আমার দাওয়াত গ্রহণ করুন কাল না হয় আবার রেখে নিবেন।" (প্রস্তাবের সূরে রাওহ বিন যামবা)

— "আপনি কী আমার জীবনের গ্যারান্টি দিতে পারবেন?"

বেদুইন রাখালের এ কথা শুনে রাওহ বিন যামবা কেঁদে ফেললেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে বললেন, আপনি আপনার জীবনকে হিফাজত করেছেন আর আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি মূহুর্ত নষ্ট করছি।[৪৮]

মুআজ বিন জাবাল (রাঃ) এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি সিয়ামের ব্যাপারে আশা ব্যক্ত করে বলেছিলেন, আফসোস! কঠিন রোজার মাঝে লাগা পিপাসাও খতম হয়ে যাবে।[৪৯]

সাহাবায়ে কিরাম জানতেন, সফরের মাঝে সিয়াম ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি রয়েছে। সেই সাথে সিয়ামের প্রতিদান, বরকত ও সাওয়াবের ব্যাপারেও জানতেন। তদুপরি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার এই বাণী সম্পর্কেও ছিল তাদের অগাধ কৃতজ্ঞতাবোধ —

وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

আর যদি রোজা রাখ, তবে তোমাদের জন্যে বিশেষ কল্যাণকর, যদি তোমরা তা বুঝতে পার।

এ কারণেই আমাদের নিজেদের মধ্যে হিম্মত তৈরি করা এবং সফরে থাকাবস্থায় সিয়ামকে ছেড়ে না দিয়ে রেখে দেওয়াটাই উত্তম। সিয়াম পালনে কষ্ট ও ক্ষতির তুলনায় এর উপকার ও ফায়দা অনেক বেশী।

হামযা ইবন আমর আসলামি (রাঃ) অধিকাংশ সময় সফরে সিয়াম পালন করতেন। তিনি নবী করিম ﷺ এর কাছে সফরে সিয়াম পালনের মাসআলা জিজ্ঞেস করলে, তিনি ﷺ বলেন, চাইলে সিয়াম পালন করতে চাইলে ইফতার করতে পারো (না রেখে ভাঙতে পারো)। [৫১]

সালাফদের সিয়ামের ব্যাপারে ইখলাস ছিল চোখে পড়ার মত। সহজে উনারা সিয়াম কাযা করতেন না, বা চাইতেন না। কেননা, উনারা জানতেন সিয়াম আল্লাহর জন্য, আল্লাহই তার প্রতিদান দিবেন। সিয়াম হল ঢাল যা দিয়ে জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাকা যাবে। সিয়াম পালনকারীর জন্য রয়েছে বিশেষ একটি দরজা, যার নাম রাইয়ান। এই দরজা দিয়ে শুধুমাত্র রোজাদারগণ প্রবেশ করতে পারবেন। এই সমস্ত সুযোগ সালাফগণ হেলায়ফেলায় ছেড়ে দিতেন না। বোনাস অফার হিসেবে গ্রহণ করতেন। এ জন্য সিয়ামের ব্যাপারে উনার এতটাই আন্তরিক ছিলেন। মহান আল্লাহ্ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন।

— আমীন।

তথ্যসূত্র:

৩২। মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ৯২১৪, সহিহুল জামে: ৩৮৮। আলবানি হাসান বলেছেন।
৩৩। মুসনাদে আহমাদ: ১৫৮৪৪ (সহিহ)
৩৪। হাদীসে কুদসী
৩৫। বুখারি: ১৯০৪, মুসলিম শরিফেও রয়েছে: ১১৫১
৩৬। সুনানু আবি দাউদ: ২৩৫৭
৩৭। বুখারি: ১১১৩
৩৮। বুখারি: ১১৪৫, মুসলিম: ৩/১১২
৩৯। আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩/১৩৮ থেকে ১৪৫
৪০। সহিহ সুনানুত তিরমিজি আলবানি: ১৩২৫-আবু উমামা আলবাহিলি বর্ণিত]
৪১। লাতায়েফুল মাআরেফ ও কিতাবুয যুহদ লিইবনিল মুবারক
৪২। প্রাগুক্ত
৪৩। লাতায়েফুল মাআরেফ: ৪৪৮
৪৪। লাতায়েফুল মাআরেফ ৪৪৮
৪৫। লাতায়েফুল মাআরেফ: ৪৪৭
৪৬। আল উলুম-ইমাম যাহাবি (রহ), ইমাম আলবানি মুখতাসারুল উলুম নামে সংকলন করেছেন। সনদ সহিহ।
৪৭। সহিহ বুখারি: ৯৭
৪৮ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৯/৫০৭৪৯
৪৯। কিতাবুয যুহদ, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক
৫০। সূরা বাকারাহ, আয়াতঃ ১৮৪
৫১। সহিহ বুখারি, হাদীস ১৯৪৩

রমাদ্বানে সালাফদের কুরআন অনুধাবণ

রমাদ্বান মাসে সাহাবায়ে কিরাম ও অন্যান্য সালাফদের আমল সম্পর্কে যেসব বর্ণনা আমাদের কাছে পর্যন্ত পৌঁছেছে সেগুলোর প্রতি নজর দিলে বোঝা যায় যে, উনারা এ মাসে নেক আমল করার জন্য কোমর বেঁধে নিতেন। তবে, উনারা দুইটি ইবাদতকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতেন। যার একটি হল কুরআন তিলাওয়াত আর আরেকটি হল বদান্যতা।

❖ তিলাওয়াত ও বদান্যতা

সাহাবায়ে কিরামগণের চোখের মণি নবী করিম ﷺ রমাদ্বানুল মুবারকে দুইটি আমলের বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। সাইয়্যিদুনা আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন,

> রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামনে প্রত্যেক বছর রমাদ্বানে একবার কুরআন পড়া যেত। যে বছির তিনি ﷺ ওফাতপ্রাপ্ত হন সে বছর দু'বার কুরআন খতম করা হয়। [৫২]

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,

> "রাসূল ﷺ সকল মানুষের চেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন। আর রমাদান মাসে যখন জিবরীল (আঃ) তার সাথে সাক্ষাতে মিলিত হতেন তখন তিনি আরো দানশীল হয়ে উঠতেন। জিবরীলের সাক্ষাতে তিনি বেগবান বায়ুর চেয়েও বেশী দানশীল হয়ে উঠতেন।[৫৩]

কুরআনুল কারীম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বাণী। যা তিলাওয়াত করলে তাঁর সাথে বান্দার সম্পর্ক মজবুত হয়। নফস পরিশুদ্ধ হয়। আমলের মাঝে উদ্যমতা ও প্রফুল্লতা মিলে। প্রবৃত্তি ও খাহেশাতের জেদি ঘোড়ার পরিচয় কুরআনুল কারীম তেলাওয়াতের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। এমনকি কুরানের নূর নফসকে বশে নিয়ে আসে। সহজেই এর গলায় লাগাম লাগিয়ে দেয় । পূর্ণ একাগ্রতা, মনোযোগ ও আগ্রহের সাথে কুরআন তিলাওয়াত ও অনুধাবণ করলে, মনে হয় এ যেন খোদ আল্লাহ তা'য়ালার সাথে বান্দা কথা বলছে।

সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এর মাঝে কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি এতটাই ঝোঁক ছিল যে, উনাদের শরীরে তীর বিঁধে গেলেও সে ব্যাপারে বেখায়াল থাকতেন।(৫৪)

তাঁরা জানতেন, কিয়ামত দিবসে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াতকারীর মাকাম ও মর্যাদা নৈকট্যশীল ও সম্মানিত ফিরিশতাদের সমান সমান হবে।(৫৫) তাছাড়া কুরআনুল কারীমের প্রতি হরফ তিলাওয়াতে দশ নেকীর পুরস্কার তো আছেই।(৫৫)

কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করলে আসমান হতে সাকিনা অবতীর্ণ হয়। কুরআন মাজীদ রাসূলে আকরাম ﷺ এর অন্তরে অবতীর্ণ হয়। আর তিনি সেই অন্তরকেই নুরের মারকাজ বানান। এই উম্মাহর বুকেও কুরআনের প্রকৃত আছর ও প্রভাব অর্জিত হলে অন্তরের নূর চোখের পানি হয়ে গড়িয়ে পড়ে।

কুরআনুল হাকিম অবতীর্ণ হওয়ার সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ এর তনুমন তাতে মশগুল হয়ে যেত। সাহাবায়ে কিরামগণও (রাঃ) জানতেন, আমাদেরকেও ঐ পবিত্র কালামকে বুকে ধারণ করে নিতে হবে, এবং পালঙ্কর্তার বিধি-নিষেধগুলো আমল করার জন্য অন্তরের দরজা উন্মুক্ত করে দিতে হবে।

কুরআন মাজীদের প্রভাব ও ভীতির আলামত ছিল এই যে, এটা নাজিল হওয়ার সময় নবীজি ﷺ এর ঘাম ছুটে যেত। কঠিন শীতের সময়েও শরীরের মাঝে কম্পন সৃষ্টি হত। তিলাওয়াত করার সময়েও একজন মুসলিমের অবস্থা এমন হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেমন ইরশাদ হচ্ছে —

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

আল্লাহ উত্তম বাণী তথা কিতাব নাযিল করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, পূনঃপূনঃ পঠিত। এতে তাদের লোম কাঁটা দিয়ে উঠে চামড়ার উপর, যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, এরপর তাদের চামড়া ও অন্তর আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়। এটাই আল্লাহর পথ নির্দেশ, এর মাধ্যমে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।

❁ সালাফদের সিয়াম

কুরআন নাজিলের সময় রাসূল ﷺ দুনিয়া ও তার মাঝে যা কিছু আছে তাঁর সবকিছুকে ভুলে যেতেন। ভরা মজলিসে সাহাবাগণ (রাঃ) এর মাঝে থেকেও তিনি তাদেরকে ভুলে যেতেন।

অনুরূপভাবে এই ঐশ্বী কালাম তিলাওয়াত করার সময় একজন মুসলিমের ভিতরেও ঐ পরিমাণ তৃপ্তি ও স্বাদ আসা চাই, যে স্বাদে সে দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তা ভুলে যায়।

রমাদ্বানুল মুবারক আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে বিশেষ এক নিয়ামত। এই বিশেষ মাসে তিনি কুরআনুল কারীম নাজিল করেছেন। এটি এমন একটি বিশেষ মাস যে মাসে তাঁর জন্য সিয়াম, দান সদাকা, কিয়ামুল লাইলে কুরআন তিলাওয়াত, অথবা দিনের বেলায় ঘরে বসে তিলাওয়াত করা হয়। সবকিছু মিলে সবার মাঝে এক স্বর্গীয় সুখ সৃষ্টি হয়।

আমাদের সালাফগণ রামাদ্বানের একটি শিক্ষার ব্যাপারে পূর্ণ অবগত ছিলেন। এ মাসের কম খাওয়া, কম কথা বলা এবং কম ঘুমানোর মাধ্যমে ফিরিশতাদের সাথে উঠাবসা ও তাদের সাদৃশ্যতা অর্জন করা — এর জন্য রমাদ্বানুল কারীম ছাড়া আর কোন উত্তম মাস নেই। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম শিহাবুদ্দিন যুহরি (রহ) রমাদ্বান মাসকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, "এ হল কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করা এবং খানা খাওয়ানোর মাস।"[৫৮]

ইবন আবদিল হিকাম (রহ), ইমাম মালিক (রহ) এর ব্যাপারে বলতেন, "রমাদ্বানুল মুবারক আগমনের সাথে সাথে তিনি হাদিসের মজলিস এবং আহলুল ইলমের মজলিসে আর বসতেন না, মুসহাফ (কুরআন) খুলে তিলাওয়াতে মনোনিবেশ করতেন।"[৫৯]

বর্তমান সময়ের প্রসিদ্ধ আরব লেখক ও প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন আইদ্ব আল কারনি লিখেন, ইমাম মালিক (রহ) রমাদ্বানের চাঁদ দেখা গেলে তাঁর কিতাবগুলিকে উঠিয়ে রেখে কুরআন মাজীদ নিয়ে বসে যেতেন। সর্বদা অজু অবস্থায় থাকতেন। মাসজিদে বসে কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন হতেন। তিনি বলতেন, "এ হল কুরআনের মাস, এ মাসে কুরআনের সাথে কথা বলা ছাড়া আর কোন কথা নেই।"[৬০]

খেয়াল করুন, যে ইমাম মালিক (রহ) মাসজিদে নববিতে একাধারে হাদিসের দরস দিতেন, কোনদিন বাদ দিতেন না। যার দরসে হাজার হাজার মানুষ দরস গ্রহণ করার জন্য হাজির হতো। যিনি আহলুল ইলমদের অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা দিতেন। যারা অন্যান্য শহর থেকে হাদিস শেখার জন্য আসতো, তিনি তাদেরকে নিজ ঘরে মেহমানদারি করতেন। এতকিছুর পরেও রমাদ্বান মাসে তিনি তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন হয়ে যেতেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট বিনয়ী হওয়ার চেষ্টায় রত হতেন।

আইদ আবদুল্লাহ আল কারনি (হাফিজাহুল্লাহ) আরও লিখেন, "অধিকাংশ সালাফ রমাদ্বান মাস শুরু হয়ে গেলে মাসজিদের সাথে সম্পর্ক বাড়িয়ে দিতেন। জিকরে ইলাহি ও তিলাওয়াতে কুরআনে মশগুল হয়ে যেতেন। নিতান্তই কোন প্রয়োজন না পড়লে বাড়ির পথে পা বাড়াতেন না।

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ) রমাদ্বান মাস শুরু হয়ে গেলে ফতওয়া দেওয়া বন্ধ করে দিতেন। তিনি ঘরে বসে বসে জিকরে ইলাহি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার এবং কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতে মশগুল হতেন।[৬১]

কুরআনুল কারিমের হাফিজ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সালাফগণ মুসহাফ খুলে খুলে তিলাওয়াতের প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। মুসহাফ খুলে তিলাওয়াতের মাধ্যমে কুরআনুল হাকীমের শব্দমালা এবং এর অন্তর্নিহিত বিষয়াদি তাদাব্বুর করতেন। ফুলের মালার মত সেগুলোকে নিজেদের অন্তরে গেঁথে নিতেন। অবস্থা এমন হয়ে যেত যে, কোন প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের স্বাক্ষাতের স্বাদ হাসিল করে ফেলেছে।

আহনাফ বিন কায়স (রহ), বিশিষ্ট তাবেয়ি যখন এই আয়াতটি শুনেন,

لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

আমি তোমাদের প্রতি একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি; এতে তোমাদের জন্যে উপদেশ রয়েছে। তোমরা কি বোঝ না? [৬২]

সাথে সাথে তিনি আঁতকে উঠেন। আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তিনি ব্যাপক আগ্রহ নিয়ে কুরআন মাজীদের পাতায় পাতায় নিজের জন্য উপদেশ অনুসন্ধান করতে লাগলেন। কুরআনে বিভিন্ন ধরণের লোকদের বর্ণনা জানার পর, যখন তিনি এই আয়াতে পৌঁছলেন,

> وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
>
> "আর কোন কোন লোক রয়েছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা মিশ্রিত করেছে একটি নেককাজ ও অন্য একটি বদকাজ। শীঘ্রই আল্লাহ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়। [৬৩]

তাৎক্ষনিক বলেলেন, "ব্যস, ব্যস! আমি আমার উপদেশ পেয়ে গেছি।"

এগুলো ছিল সালাফদের কুরআনুল হাকীমকে মনোযোগ সহকারে, মহব্বত এবং আগ্রহের সাথে তিলাওয়াত করার ফল। সাহাবায়ে কিরামগণ (রাঃ) কুরআন তিলাওয়াতের আগ্রহ ছিল আরো এক ধাঁচ উপরে। উনারা বেশির ভাগ তিনদিনে কুরআন খতম করতেন। কোন কোন সাহাবা (রাঃ) সাতদিনে আর কেউ কেউ চল্লিশ দিনে খতম করতেন। [৬৪]

আবু হুজাইফা (রাঃ) এর আযাদকৃত গোলাম সালিম (রাঃ) এত সুন্দর করে কুরআন তিলাওয়াত করতেন যে, এক রাতে আম্মাজান আ'ইশা (রাঃ) ইশার সলাতের পর ফিরে আসার সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনেছিলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ কে এ ব্যাপারে অভিহিত করা হলে তিনিও আ'ইশা (রাঃ) এর সাথে দাঁড়িয়ে তাঁর তিলাওয়াত শুনেন। [৬৫]

আবু মুসা আশআরি (রাঃ) এর কুরআন তিলাওয়াতের দরদ ও মিষ্টতা দেখে হযরত আবদুল্লাহ বিন কায়স (রাঃ), বলেন, তাকে অন্তরে দাউদি দাউদি সুর) দেওয়া হয়েছে। [৬৬]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) এত সুন্দর, সুলালায়িত কণ্ঠে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর তিলাওয়াত শুনে তাকে মুবারকবাদ জানিয়ে বলেন, "যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদকে সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করতে চায়, সে যেন আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের মত কিরাত পড়ে।"[৬৭]

তাবিয়িন এবং তাবে-তাবিয়িনগণও কুরআনুল কারিমের তিলাওয়াত দ্বারা নিজেদের অন্তরে ইমান্দের স্বাদ ও সজীবতা ধরে রাখতেন। উনাদের অধিকাংশ রজনী সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় অতিক্রান্ত হত। আর সে সলাতে থাকত লম্বা লম্বা তিলাওয়াতে সমাহার। যখন রমাদ্বান মাস এসে যেত, তখন উনাদের এই আমল বহুগুণে বেড়ে যেত।

আবদুর রাজ্জাক (রহ) বলেন, যখন রমাদ্বান মাস উপস্থিত হত, তখন ইমাম সুফিয়ান সাওরি (রহ) সকল কথাবার্তা (দুনিয়াবী) ছেড়ে দিয়ে কুরআন কারিম তিলাওয়াতে মনোনিবেশ করতেন।[৬৮]

ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী (রহ) বর্ণনা করেন, "কোন কোন সালাফ রমাদ্বান মাসে তিনদিনে কুরআনুল কারীম খতম করতেন। কোন কোন সালাফ সাতদিনে কুরআন পূর্ণ খতম করতেন। তাদের মধ্যে কাতাদাহ (রহ) উল্লেখযোগ্য। কোন কোন সালাফ দশদিনে পুরা কুরআন খতম করতেন। তাদের মধ্যে আবু দুজানা আল আত্তারি (রহ) উল্লেখযোগ্য।[৬৯]

আসওয়াদ বিন কায়স (রহ) রমাদ্বানের শেষ দশকের প্রতি দুইরাতে একবার করে কুরআনুল কারীম খতম করতেন, আর রমাদ্বানের প্রথম দশকে প্রতিদিন রাতে একবার কুরআন খতম করতেন।[৭০]

ইমাম ইবনু রজব (রহ) তার লাতায়েফুল মাআরেফ কিতাবে এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করার পর একটি আলোচনা আনেন। তিনি লিখেন, "তিনদিনের কম সময়ে কুরআন খতম করা বছরের অন্যানা দিনে নিষিদ্ধ।" অতঃপর তিনি যোগ করেন, "কোন কোন সালাফের নিকট রমাদ্বানের দিন ও রাত মিলিয়ে তিনদিনের কম সময়ে কুরআন খতম করার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। নিষিদ্ধের ব্যাপারটা এই দিনগুলো বাদে অন্যান্য দিনের বেলায় প্রযোজ্য।"

❉ সালাফদের সিয়াম

রমাদ্বান মাসে কালামুল্লাহ তিলাওয়াতের স্বাদ ও আগ্রহ আজ থেকে সত্তর-আশি বছর আগেও পাওয়া যেত। লোকেরা সাহরীর পর সলাত আদায় করেই কুরআন মাজীদ খুলে পড়তে বসে যেত। আর যতটুকু সম্ভব তিলাওয়াত করে যেত। রমাদ্বানের দিনগুলোতে কুরআনের প্রতি আবাল, বৃদ্ধ, বণিতা সবার আগ্রহ একরকমই ছিল। আমাদের বর্তমান সমাজেও এই বিষয়টি বড়ই শানদার ও মুহব্বতের সাথে জারি ছিল। কিন্তু আফসোস! নানারকমের মিডিয়ার আগ্রাসন আমাদের ঘরের শিশু, মা-বোন ও পুরুষদের কাছ থেকে এই আগ্রহ ও উদ্দীপনাকে ছিনিয়ে নিয়েছে। এখন তারা ঐ সকল ফাঁদে পড়ে বেশরম বেহায়া এবং অহেতুক জিনিসে মেতে থেকে নিজেদের দ্বীন ও ইমানকে হারিয়ে ফেলছে।
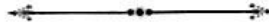
রমাদ্বান মাসে অধিকাংশ উলামা ও ফুজালাগণ অন্যান্য সকল ব্যস্ততা ছেড়ে দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত, অনুধাবন এবং দানশীলতায় মনোযোগী হতেন।

মাওলানা শাহ আবদুর রহিম রায়পুরি (রহ) এর আমলের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, উনার মজলিসে রমাদ্বান মাসে প্রায় সারাদিনই কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত হত। ইফতার শেষে মাগরিবের পর চা পান করতে যতক্ষণ সময় লাগে, তিনি ততটুকু সময় বিরতি দিতেন। এমনকি এ মাসে তিনি ডাক বন্ধ করে দিতেন এবং অন্যান্যদের সাথে সাক্ষাত করাও বাদ দিতেন।

মাওলানা আবদুল মান্নান নুরপুরি (রহ) রমাদ্বানের প্রতি রাতে তাহাজ্জুদ সলাতে দুইপারা কুরআন তিলাওয়াত করতেন। চলাফেরায় কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করে জিহ্বাকে তরতাজা রাখতেন। তিনি তার এক ছাত্রের সাথে একদিন কোন এক জায়গায় মেহমান হলেন। বিশ্রামের জন্য তাকে কোন এক কামরায় জায়গা করে দেওয়া হল। যুহরের আগে এক ছাত্র তাকে ডাকতে গিয়ে দেখলেন, তিনি কুরআন তিলাওয়াত করছেন। সলাতের পর আবারো তিনি ঐ কামরায় চলে আসেন। ঐ ছাত্র আসরের সলাতের সময় তাঁকে ডাকতে গিয়ে দেখল, তখনও তিনি তিলাওয়াত করছিলেন। আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়েও তিনি তিলাওয়াতের মাঝেই কাটান।[৭১]

বর্তমানে কুরআন তিলাওয়াতের উদ্দীপনা ও আগ্রহ আমাদের মাঝে নেই বললেই চলে। অবশ্য ইতিকাফকারী ব্যক্তির জন্য অনেক সুবিধা আছে।

তিনদিনে কুরআন খতম করার সুযোগ তাঁর হাতে থাকে। রমাদ্বানে আমাদের সমাজে কুরআন তিলাওয়াতের পরিমাণ বেড়ে যায় ঠিক, কিন্তু তা হয় খেয়ালখুশি মোতাবেক। কেউ কেউ দৈনিক একপারা তিলাওয়াত করে। কেউ কেউ একটু বেশী, আবার কেউ কেউ এর চাইতে কম। আবার সে তিলাওয়াতে তাড়াহুড়া অনেক বেশী থাকে। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে যত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় তাতেই খুশি। অথচ কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য একে তাড়াতাড়ি খতম করা না, বরং তারতীলের সাথে তিলাওয়াত করে একে বুঝার চেষ্টা করা। কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করে রব্ব কারিমের সাথে সম্পর্ককে মজবুত করা।

> রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনুল কারীমের এক একটি হরফকে স্পষ্ট করে তিলাওয়াত করতেন।(৭২)

আম্মাজান উম্মু সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

> রাসূলুল্লাহ ﷺ এক একটি আয়াতকে আলাদা করে পড়তেন এবং প্রত্যেক আয়াতে থামতেন। 'আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন' পড়ে থেমে যেতেন অতঃপর 'আররাহমানির রাহিম' পড়তেন। তারপর 'মালিকি ইয়াওমিদ্দিন পড়তেন'।"(৭৩)

কেউ কেউ আবার তারাবিতে কুরআন তিলাওয়াত শোনাকেই যথেষ্ঠ মনে করেন। হাফিজুল কুরআনগণ দৈনিক নিজের নির্ধারিত পারা মুখস্থ করা এবং তারাবিতে শোনানোকেই গণিমত মনে করেন। অথচ এরা অধিকাংশ ঝড়ের গতিতে তিলাওয়াত করে থাকেন। অবস্থ এমন হয় যে, মুক্তাদি প্রথম আয়াত শুনে বোঝার চেষ্টা করছেন, ততক্ষণে ইমাম সাহেব দুই- তিন আয়াত সামনে চলে গেছেন। তবে সবাই একরকম নয়। কিছু কিছু হাফিজুল কুরআন অত্যন্ত সুন্দর করে তারতীলের সাথে থেমে থেমে কুরআন তিলাওয়াত করেন। কুরআন তিলাওয়াতের উদ্দেশ্যই তো এটি।

অন্যদিকে এমনও মুসলিম আছে যারা রমাদ্বান মাসে ক্যাসেট, সিডি, মোবাইল কিংবা টিভি চ্যানেলে কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত অথবা কিছু কিছু সূরাহ বারবার তিলাওয়াত শুনাকেই যথেষ্ঠ মনে করেন।

Contents

❋ সালাফদের সিয়াম

এমন অনেকেই আছে যারা রমাদ্বান মাসে কুরআনের তাফসীর করান। এর জন্য বিশেষ দৌঁড়ঝাপ করতে হয় তাদের। সময় নির্দিষ্টকরণ, সেচ্ছাসেবকদেরকে জমায়েত করা, আসা যাওয়ার জন্য সহজতার ইন্তেজাম, মাইকের ব্যপস্থাপনা, ইফতারের বন্দোবস্ত করা, গরম থাকলে পাখা, এয়ার-কুলার বা ইয়ার-কন্ডিশনযুক্ত কামরার ব্যপস্থাপনা, রেকর্ড করে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়া, ইত্যাদি।

সাধারণতঃ এক্ষেত্রে অনেকেই শুধুমাত্র কুরআনের তরজমা বা কুরআনের মর্মকথা বলে দেওয়াকেই যথেষ্ঠ মনে করেন। অথচ কোন কোন স্থানে তাফসীরের অনুষ্ঠান পাঁচ-ছয় ঘণ্টা পর্যন্ত চলতে থাকে। ফলাফল এই হয় যে, তাফসীর মাহফিলের আয়োজক এবং তাতে অংশ গ্রহণকারী সকলে কুরআন তাদরীসের কাজ করেন, কিন্তু যে হাদিসগুলোতে তিলাওয়াত অথবা কিরাআতের আলোচনা এসেছে, সেগুলো খুব কমই আলোচনা করে থাকনে।

প্রকৃতপক্ষে রমাদ্বানুল মুবারকে তাফসীরুল কুরআনের মাধ্যমে মানুষদেরকে মাখলুক থেকে বিছিন্ন করে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের যে ইহতিমাম আমাদের সালাফগণ করেছেন, তার সাথে বর্তমানের আয়োজনগুলোর কোন মিল নেই। বরং উল্টোটা পরিলক্ষিত হয়। মানুষের সাথে পরস্পর মেলামেশা এবং কুরআন শিক্ষা ও তাফসীর বয়ানের বিষয়টাই যেন মূখ্য হয়ে উঠে। যদিও এই পদ্ধতিরও কিছু ফায়দা রয়েছে। যেমন, লোকেরা সিয়াম পালন করে অহেতুক কাজে সময় নষ্ট করার চাইতে, কুরআন থেকে কিছু না কিছু জানতে পারে।

আসলে তাফসীরের যে মেহনত আমাদের সমাজে রমাদ্বান মাসে করা হয় মূলত তা রমাদ্বানের বাইরে অন্যান্য দিনগুলোতে করা উচিত, হতে পারে রজব বা শাবান মাসে। আর রমাদ্বান মাসটাকে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য বান্দার বরাদ্দ করা উচিৎ। ইনফিরাদি (একাকি) ইবাদত, আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা, এবং কোলাহল ফেলে শুধুমাত্র তার দিকেই ধাবিত হওয়াটাই উদ্দেশ্য ও মাকসাদ হওয়া উচিত।

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে বোঝার তাওফীক দিন, আমীন।

তথ্যসূত্র:

৫২। বুখারি: কিতাবু বাদইল ওহি: ৬, হাদিসঃ ৪৯৯৮
৫৩। বুখারি: ৯০২, মুসলিম: ২৩০৮
৫৪। দেখুন ইকবাল কিলানি রচিত ফাজায়েলে কুরআন মাজিদের ভূমিকা, গাযওয়ায়ে জাতুর রিকা
৫৫। মুসলিম: ১৮৬২
৫৬। তিরমিজি: ২৩২৭
৫৭। সুরা আযযুমার, আয়াতঃ ২৩
৫৮। লাতায়েফুল মাআরেফ: ২৪৫
৫৯। লাতায়েফুল মাআরেফ: ২৪৫
৬০। রমজান মাহে গুফরান-উর্দু তরজমা: ১৪৬
৬১। রমজান মাহে গুফরান-উর্দু তরজমা: ১৪২
৬২। সুরা আল-আম্বিয়া, আয়াতঃ ১০
৬৩। সুরা তাওবা: ১০২
৬৪। ইবন মাজাহ: ১১০৫
৬৫। ইবন মাজাহ: ১১০০
৬৬। ইবন মাজাহ: ১১০২
৬৭। ইবন মাজাহ: ১১৪
৬৮। লাতায়েফুল মাআরেফ: ২৪৫
৬৯। লাতায়েফুল মাআরেফ: ২৪৫
৭০। লাতায়েফুল মাআরেফ: ২৪৫
৭১। মাহনামা আলমুকাররম, আবদুল মান্নান নুরপুরি সংখ্যা
৭২। তিরমিজি: ২৯২৭
৭৩। আবু দাউদ: ৩৪৮৭

সালাফদের শেষ দশক

রমাদ্বান মাসের শেষ দশক মূলত ঐ দশক যাতে লাইলাতুল কদর রয়েছে। লাইলাতুল কদরের এক রাতের ইবাদত হাজার রাত ইবাদত করার চেয়েও বেশি ফজিলতপূর্ণ। যাতে মাগরিব থেকে নিয়ে ফজর পর্যন্ত শান্তি বর্ষণ হতে থাকে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন,

> যে ব্যক্তি কদরের রাত্রিতে ঈমান ও সাওয়াবের আশায় দন্ডায়মান হবে তার পিছনের সকল গুনাহকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[৭৪]

ইমাম শা'বি (রহ) লাইলাতুল কদরের ব্যাপারে বলেন, "আমি এর দিনেও তেমনই ইবাদত করার চেষ্টা ও মেহনত করতে পছন্দ করি যেমন এর রাতগুলোতে করি।"[৭৫]

কোন কোন সালাফ লাইলাতুল কদরের আগমনকে এভাবে স্বাগতম জানাতেন যেভাবে সম্মানিত কোন মেহমানকে স্বাগতম জানানো হয়। কদরের রাতকে সামনে রেখে উনারা আত্মিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার পাশাপাশি শারীরিকভাবেও প্রস্তুত হওয়াকে পছন্দ করতেন।

ইবনু জারির (রহ) রমাদ্বানুল মুবারকের শেষ রাত্রিগুলোর প্রতি রাতেই গোসল করতেন। ইমাম নাখয়ি (রহ) শেষ দশকের প্রতি রাতেই গোসল করতেন। সালাফদের কেউ কেউ সে রাতে গোসল করে নিতেন যে রাত তাদের নিকট লাইলাতুল কদর হওয়ার বেশি সম্ভাব্য মনে হত।[৭৬]

সাবিত আল বুনানি (রহ) বলেন, সাহাবী তামিম আদ-দারি (রাঃ) এর কাছে এক অলংকার ছিল। তিনি এক হাজার দিরহাম দিয়ে সেটি ক্রয় করেছিলেন। যে দিন তার কাছে মনে হত আজ লাইলাতুল কদরের রাত, সেদিনি তিনি অলংকারটি পড়ে ইবাদাতে মশগুল হতেন।[৭৭]

হাবিব ইবন আবি মুহাম্মাদ (রহ) এবং তার স্ত্রী, উনারা দুজনেই আল্লাহ্‌ওয়ালা ও দুনিয়াবিমূখ ছিলেন। যখন রমাদ্বানের শেষ দশকে পৌঁছে যেতেন তিনি তখন তার স্ত্রী তাকে বলতেন, "রাত বিগত হল, অথচ আমাদের সামনে দীর্ঘ পথ, পাথেয় খুবই কম। সালাফ-আস-সালিহীনদের কাফেলা আমাদের আগে চলে গেছে, আর আমরা এখনও পিছনে পড়ে আছি।" [৭৮]

আহ! আজকাল এমন স্ত্রী কোথায়, যারা তাদের স্বামীদেরকে ইবাদতের জন্য জাগিয়ে দিবে। যারা স্বামীকে মনে করিয়ে দিবে, আখিরাতের দীর্ঘ ও অফুরন্ত জীবনের জন্য এই দুনিয়া থেকেই পাথেয় জমাতে হবে। হায়! যদি আজকালকার মহিলাদের অন্তরে এই অনুভূতি জাগ্রত হত, আর নবীজি ﷺ এর ঐ দুআ অর্জনকারিণী হয়ে যেত —

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

> আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর রহম করুন যে ব্যক্তি রাতে উঠে নফল আদায় করে, অতঃপর তার স্ত্রীকে জাগায় আর সেও নফল আদায় করে। আর স্ত্রী উঠতে আলসেমি করলে তাকে পানির ছিটা দিয়ে জাগায়। আল্লাহ রহম করুন ঐ মহিলার উপর যে মহিলা রাতে উঠে নফল আদায় করে এবং তার স্বামীকে জাগায় আর সেও নফল আদায় করে। আর যদি সে উঠতে অলসতা করে তাহলে সে তাকে পানির ছিটা দিয়ে জাগিয়ে দেয়। [৭৯]

সালাফ আস-সালিহীনগণ রমাদ্বান মাসে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে ইবাদত-বন্দেগী, তিলাওয়াত, কিয়ামুল-লাইল এবং দান খয়রাত করতেন। এতদসত্ত্বেও আশা ও ভয়ের মাঝে থাকতেন যে, তাদের আমল রব্বুল আ'লামিনের দরবারে কবুল হবে কিনা? উনারা জানতেন প্রত্যেক আমলের কবুলিয়্যাত নির্ভর করে ইখলাসের বা আন্তরিকতার উপর। আর ইখলাস এমনই এক অমূল্য, সুক্ষ্ম এবং দুষ্প্রাপ্য সম্পদ যাকে অর্জন করার জন্য সালাফগণ যারপরনাই চেষ্টা ও মেহনত করতেন। তবুও তাদের নিকট তা সামান্যই মনে হত।

কেননা বান্দার বড় বড় আমলও সামান্যতম রিয়া বা লৌকিকতা এবং গোপন তাকাব্বুর বা অহংকারের কারণে একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। এ কারণেই

❁ সালাফদের সিয়াম

আমাদের সালাফগণ এত আমল করেও আল্লাহ তা'য়ালার সামনে হাজির হওয়ার ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত থাকতেন।

রমাদ্বান মাস যখন শেষ দিনগুলোর দিকে চলে যেত, তখন সালাফগণ আফসোস করতেন। দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে অনুশোচনা করেতেন এই জন্য যে, গুনাহ মাফের মাসে যেসব আমল করা দরকার ছিল, তার কিছুই করা হয়ে উঠেনি। জানা নেই, আগামীতে এই মূল্যবান মাসটি নসিব হবে কিনা?

আবু কিলাবাহ (রহ) রমাদ্বানের শেষ দিনগুলোতে তার সুন্দরী দাসীদেরকে এই আশায় আজাদ করে দিতেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন তার এই আমলের কারণে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিবেন।[৮০]

আমাদের সালাফগণ তাদের অন্তর্চক্ষু দিয়ে কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত জাহান্নামের ভয়ানক দৃশ্য দেখতে পেতেন। এটা ছিল তাদের মজবুত ঈমানের পরিচয়। উনারা এটিও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, জান্নাতের ঐ অসাধারণ ও অতুলনীয় দৃশ্য দেখার জন্য ভঙ্গুর দুনিয়ার তুচ্ছ স্বাদগুলোকে বাদ দিতে হবে। উনারা এসব থেকে দূরেও থাকতেন। আমাদের সালাফগণ জানতেন, জাহান্নামকে তার চতুর্দিক থেকে খাহেশাত ও দুনিয়াবি রঙ্গতামাশা দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। দুনিয়ার এই সব রঙ্গতামাশা বান্দাকে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যায়। অভিশপ্ত শাইত্বন দুনিয়ার জীবনকে ছলনার খোলসে আবৃত করে দেখানোর চেষ্টা করে। অথচ বাস্তবতা হল, এই ছলনার ফাঁদে পা দিয়ে নফস ও শাইত্বনের অনুসরণ করে বান্দার ঠিকানা হয় উত্তপ্ত জাহান্নামের আগুনে। সালাফগণ কুরআনের এই শিক্ষাকে বুকে লালন করে দুনিয়াবী সকল চাকচিক্য থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখেছিলেন।

আমাদের সালাফগণ কুরআন ও হাদিসে জান্নাতের অপূর্ব দৃশ্যসমূহ অন্তর্চক্ষু দিয়ে দেখতে পেতেন। উনারা জানতেন, জান্নাতের উঁচু উঁচু প্রাসাদ, বালাখানা, মহল, আনতনয়না পবিত্র হুরগণ, দুধ-শরাবের ঝর্ণা সুস্বাদু ফলফলাদি, আর সবচাইতে বড় নিয়ামত রব্বে কারীমের স্বাক্ষাৎ - এগুলো শুধুমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ-নিষেধ মানার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। এজন্যই উনাদের এত দৌঁড়ঝাপ। নিজেদের আমল আরশের মালিকের কাছে পছন্দ হল কি না তাঁর জন্য তাদের এত চেষ্টা তদবির। মনে একটাই আশা আল্লাহকে খুশি করতে পারলে জান্নাতে তাদের অবস্থান পাকা।

আলী ইবন আবি তালিব (রাঃ) রমাদ্বানের শেষ রাতে আওয়াজ দিয়ে বলতেন, "সে কোথায় আছে, যার আমলগুলো কবুল হয়েছে। আমরা তাকে মুবারকবাদ জানাবো। সে কোথায় আছে যে রমাদ্বানের বরকত থেকে মাহরূম রয়ে গেছে। আমরা তাকে সান্তনা দিব। [৮১]

আলী (রাঃ) বোঝাতে চাইতেন, যখন আমার জানা নেই যে রমাদ্বানে আমার কৃত আমলগুলো কবুল হয়েছে কি না - তাহলে কীসের এত খুশি? কোন সে জ্ঞান আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে? কোন সে জ্ঞান আমাকে জান্নাত হাসিল করেছি বলে জানিয়েছে? আল্লাহর সামনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত কে আমাকে জানাবে এসব।

কোন কোন সালাফ ঈদের দিনেও বিষণ্ণ থাকতেন। এই খুশির দিনেও চিন্তিত কেন জিজ্ঞেস করা হলে, উনারা বলতেন —

"আপনি সত্য বলেছেন, তবে আমিতো স্রেফ গোলাম আর আমাকে আমার মালিক আদেশ দিয়েছেন যেন আমি তার ইবাদত করি। আমি জানি না যে, তিনি আমার আমলগুলো কবুল করে নিয়েছেন কিনা?"[৮২]

জনাব উহাইব বিন ওয়ারদ (রহ) একদল লোককে ইদের দিন বেশ হাসাহাসি করতে দেখে ব্যথিত হৃদয়ে বললেন, "যদি তাদের রোজা কবুল হয়ে থাকে, তাহলে শুকরিয়া আদায়কারীদের পদ্ধতি এরকম নয়, আর যদি তাদের রোজা কবুল না হয়ে থাকে, তাহলে পেরেশানী প্রকাশের রীতিনীতি বা আচরণ এরকম নয়।" [৮৩]

তথ্যসূত্র:

৭৪। বুখারি: ১৯০১
৭৫। লাতায়েফুল মাআরেফ: ২৮৮
৭৬। লাতায়েফুল মাআরেফ: ২৬৯
৭৭। লাতায়েফুল মাআরেফ: ২৬৯
৭৮। লাতায়েফুল মাআরেফ: ২৬৫
৭৯। আবু দাউদ: ১৩০৮, নাসায়ি: ৩/২০৫
৮০। লাতায়েফুল মাআরেফ: ৩০০
৮১। লাতায়েফুল মাআরেফ: ২৯৮
৮২। লাতায়েফুল মাআরেফ
৮৩। লাতায়েফুল মাআরেফ: ২৯৪

শেষ কথা

রমাদ্বানুল মুবারকের গুরুত্ব বুঝে সালাফ আস-সালিহীনদের তরিকা ও পদ্ধতি অনুযায়ী চলা আমাদের প্রয়োজন ও মেহনতের মূল লক্ষ্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাদেরকে আত্মশুদ্ধি, তাকওয়া ও পরহেযগারীর ক্ষেত্রে আমাদের সালাফ আস-সালিহীনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার তাওফিক দিন। তারাই তো ঐ কাফেলার পথিক যাদের ব্যাপারে আমরা প্রতি ওয়াক্তে সলাতে দাঁড়িয়ে দুআ করি,

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ –
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

"আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।"

— আমিন।
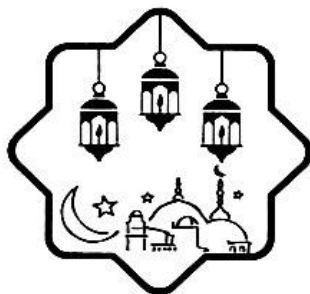
সালাফদের সিয়াম

(৩য় অংশ)

সম্পাদনা ও সংগ্রহ: রাজিব হাসান

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"রমাদ্বান মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, যা মানবজাতির জন্য দিশারী এবং এতে পথনির্দেশ ও সত্য–মিথ্যার পার্থক্যকারী সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাসে (স্বস্থানে) উপস্থিত থাকবে সে যেন রোযা রাখে"।

(সূরা বাকারাহ-১৮৫)

সালাফদের সারাবছরের সিয়াম

"সালাফগণ ছয়মাস ধরে আল্লাহর কাছে দুআ করতেন যেন তিনি তাদেরকে রমাদ্বান পর্যন্ত পৌঁছে দেন, এবং পরবর্তী ছয়মাস ধরে দুআ করতেন যেন আল্লাহ তাদের রমাদ্বান ও অন্যান্য সময়ের ইবাদাহ কবুল করে নেন।"

তথ্যসূত্রঃ মুলা'ব আল ফজল (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণিত আবুল -ক্বাসিম আল -আসবাহানী আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, আর্টিকেল - ১৭৬১

রমাদ্বান কড়া নাড়ে

আলহামদুলিল্লাহ, রমাদ্বান মাস দরজায় কড়া নাড়ছে। এ মাসে আমরা পুরো উদ্যমে সলাত আদায় করব, কুরআন তিলাওয়াত করব, বেশী বেশী দান সদাক্বা করব, কোমর বেঁধে সিয়াম পালন করব, লাইলাতুল কদরের তালাশ করব, সাহরী ও ইফতার করব, ইতিকাফ করব, চোখের পানি ফেলে দুআ ও ইস্তিগফার করব। কতশত প্রস্তুতি হাতে নিয়েছি আমরা ই বি-ইযনিল্লাহি তায়ালা। কিন্তু, একটি গুরুত্বপূর্ণ আমলের ব্যাপারে আমরা বরাবরের মতই উদাসীন থাকব। আর সেটা হচ্ছে, যাদের সাথে আমাদের মনমালিন্য হয়েছে, আমরা তাদের সাথে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলব না। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বেরাদার, বন্ধুবান্ধব, কলিগ, সহপাঠীদের সাথে ভেঙে যাওয়া সম্পর্কগুলো জোড়া লাগাবো না। এগুলো অমিমাংসিত রেখেই রমাদ্বান শুরু করব। শাইত্বনের ধোঁকায় পড়ে হয়ত কোন এক কারণে পরিচিতজনদের সাথে আমাদের মনমালিন্য হয়েছিল, কোন এক কারণে তাঁদের সাথে ঝগড়া হয়েছিল কিন্তু সেই ভারী বোঝা এখনও বহন করে চলছি নিজের অজান্তে। যা কখনই ঠিক হচ্ছে না।

> রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা তার সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কী তোমাদেরকে এমন আমলের কথা বলে দিবো না যা সলাত, সিয়াম এবং সদাক্বার চাইতে উত্তম?
>
> উত্তর এলো, "হ্যাঁ।"
>
> তিনি ﷺ তখন বললেন, إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ
> "মানুষের মধ্যে মিমাংসা করে দেওয়া"[১]

আল্লাহ তায়ালার দরবারে আমাদের তওবাহ ও দুআ কবুল না হওয়ার অনেকগুলো কারণের মধ্যে এটিও একটি কারণ —এক মুসলিমের সাথে আরেক মুসলিমের কলহের জের। একজনের সাথে আরেকজনের অমিমাংসিত হিসাব কিতাব। অনেক দিন ধরে জিইয়ে রাখা রাগ, ক্ষোভ, হিংসা, বিদ্বেষ। এগুলোর কারণে আল্লাহর দরবারে আমাদের তাওবাহ ও দুআ কবুল হয় না।

অপর এক হাদীসে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন,

> "মানুষের আমলনামা প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়, অতঃপর আল্লাহ সকল মুসলিমকে ক্ষমা করে দেন, তারা ব্যতীত যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে, আর দুই ব্যক্তি যারা নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত হয়। আরো বলা হয়েছে, যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যে মিমাংসা করে নেয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে ক্ষমা করা হয় না।[২]

কাজেই, আমরা যা জলঘোলা করার ছিল, তা করে ফেলেছি। দিনে দিনে অনেক দিন হয়েছে। কালে কালে অনেক কাল হয়েছে। এবার দীল নরম করার পালা। ঠান্ডা মাথায় নিজের আসল লাভ ক্ষতি নিয়ে চিন্তা করার পালা। আমাদের সামনে এমন একটি মাস আসতে যাচ্ছে, যখন আমরা পাগলের মত আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকব, কবরের আযাব থেকে মাফ চাইতে থাকব, জান্নাত চাইতে থাকব, জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চাইব, কিন্তু আমাদের সকল দু'আই আল্লাহ্ ফিরিয়ে দিবেন শুধুমাত্র এই একটি কারণে। আর তা হল, মুসলিম ভাইবোনদের সাথে বিবাদ মিটমাট না করা। প্রিয় ভাই, আমাকে বলুন, তুচ্ছ এই দুনিয়াবী অহংকার, রাগ ও জিদের কারণে আল্লাহর রহম থেকে কে বঞ্চিত হতে চায়?

ভাই, বলি শুনুন, কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে যদি আপনার এরকম কোন ঝামেলা থেকে থাকে, তাহলে তার সাথে আজকেই এসব ঝামেলা মিটিয়ে ফেলুন। মনমালিন্য, রাগারাগি, ঝগড়াঝাটি প্রলম্বিত না করে আজকেই এর একটি সুরাহা করুন। এই চোরাবালির ফাঁদে নিজের আমল হারিয়ে ফেলবেন না। আপনার নিজের এরকম কোন ঝামেলা না থাকলে, পরিবার বা আত্মীয়স্বজনের মধ্যে থাকলে আজকেই তা মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। ধরুন —

— পিতা ও পুত্রের মধ্যে,

— স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে,

— ভাইদের ও বোনদের মধ্যে,

— ব্যবসায়ীক পার্টনারদের মধ্যে,

— মাসজিদ কমিটির সদস্যদের মধ্যে,

— অন্যান্য আত্মীয় - স্বজনদের মধ্যে

দেরী না করে মিমাংসা করে ফেলুন, মিটমাট করিয়ে দিন, যাতে করে আপনাদের মধ্যে এরকম কোন ঝামেলা আর না থাকে। বিশ্বাস করুন, আপনার এক কদম এগিয়ে আসার কারণে মহান আল্লাহ্ আপনার জন্য উত্তম প্রতিদানের ব্যবস্থা করবেন। এই আমলের মাধ্যমে আপনি জান্নাত হাসিল করতে পারবেন বি-ইযনিল্লাহি তায়ালা।

রমাদ্বান কড়া নাড়ছে। যার সাথে আপনার ঝামেলা হয়েছে তাঁর দরজায় কড়া নাড়ুন। তাঁর সামনে গিয়ে হাসিমুখে লম্বা একটা সালাম দিয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে নিন। দেখা করা সম্ভব না হলে মোবাইল ফোনটি হাতে তুলে নিন। তার সাথে এক মিনিট কথা বলুন। নরম ভাষায় তাঁর কাছে ক্ষমা চান। দেখবেন বরফ গলে যাবে। অথবা ধরুন দোষ তাঁরই, তবুও তাঁর সাথে কথা বলে মিটমাট করে ফেলুন। বরফ ভেঙে ফেলুন।

আল্লাহর রহমত হাসিল করুন। বারাকাল্লাহু ফীক।

১। মুসনাদে আহমদ, আবু দারদা (রাঃ) এর বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত
২। সহিহ মুসলিম, আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত বিশুদ্ধ সূত্রে

রমাদ্বানের আসার আগে

রমাদ্বানের মূল উদ্দেশ্য কি শুধু বাজার করা? খাওয়া দাওয়া? আমাদের এই বাজারকেন্দ্রিক ব্যস্ততা আর গৃহস্থালীর কেতাদুরস্ততা আমাদেরকে রমাদ্বানের প্রকৃত প্রস্তুতি থেকে দূরে রাখছে না তো? শুধু কি উদরপূর্তিই রমাদ্বানের মূল উদ্দেশ্য?

না, একদম না। রমাদ্বানের মূল উদ্দেশ্য এসব না। বরং নবী করিম ﷺ রজব ও শাবান মাস থেকেই রমাদ্বানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। আত্মিক ও শারীরিক প্রস্তুতি নিতেন। রমাদ্বান আসার পূর্বমূহুর্তে সালাফগণও একইভাবে প্রস্তুতি নিতেন। আমরাও ঠিক একইভাবে নিজেদেরকে ঢেলে সাজাতে পারি। এজন্য রমাদ্বানের আসল উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নিম্নলিখিত দশটি প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারি বি-ইযনিল্লাহি তায়ালা —

১। আন্তরিক তাওবাহঃ তাওবাহ সবসময়কার জন্য। নবীজি ﷺ দিনে সত্তরবারের অধিক তাওবাহ করতেন। আমাদেরও বেশী বেশী তাওবাহ করা উচিৎ। রামাদ্বান আসার আগে নিজের কৃত গুনাহের জন্য বেশী বেশী তাওবাহ ও ইস্তিগফার করা, রমাদ্বানে একদম পুতঃপবিত্র আর প্রশান্ত আত্মা নিয়ে রহমত হাসিলের উদ্দেশ্য আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল হওয়া। বেলা শেষে এসবই মূখ্য।

মহান আল্লাহ্ বলেন,

أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবাহ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[১]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবাহ কর; কেননা আমি আল্লাহর কাছে দৈনিক একশতবার তাওবাহ করে থাকি।"[২]

২। দুআঃ সালাফদের কেউ কেউ রমাদ্বান আসার ছয়মাস আগে থেকেই দুআ করতেন। আল্লাহর কাছে কাঁদতেন যেন তিনি তাঁদেরকে রমাদ্বান পর্যন্ত জীবিত রাখেন। প্রতিটি মুসলিমের উচিৎ বেশী বেশী দুআ করা যেন মহান আল্লাহ্ তাঁদেরকে রমাদ্বান পর্যন্ত পৌঁছে দেন। সুস্থ শরীরে আর দৃঢ় প্রত্যয়ে পুরোটা রমাদ্বান ইবাদাত বন্দেগীতে কাটানোর সামর্থ্য যেন তিনি দেন, আর প্রতিটি আমল কবুল যেন তিনি করে নেন, আমিন।

৩। প্রফুল্ল চিত্তঃ রমাদ্বানকে কখনই বোঝা মনে না করা বরং এই নিয়ামতকে রহমান আল্লাহর তরফ থেকে উপহার বা বিশেষ নিয়ামত মনে করা। সারাটি মাস জুড়ে জান্নাতের দরজা খুলে রাখা হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে রাখা হয় – এই উম্মতের জন্য এটা কতটা নিয়ামতের, কতটা সম্মানের, তা বেশী বেশী অনুধাবন করা। রমাদ্বান কুরআন নাযিলের মাস। রমাদান ক্ষমার মাস। রহমতের মাস। নাজাতের মাস। তাকওয়া অর্জনের মাস। নিজেকে পরিশুদ্ধ করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার মাস। এ জন্য আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানীর প্রতি সন্তুষ্ঠ থাকা আমাদের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য। কখনই এ মাসটিকে অবহেলা, অবজ্ঞা ও হেলায়ফেলায় কাটিয়ে দেওয়া উচিৎ নয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

"বল, আল্লাহর দয়া ও মেহেরবাণীতে। সুতরাং এরই (ইসলাম ও কুরআনের) প্রতি তাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ। এটিই উত্তম সে সমুদয় থেকে যা সঞ্চয় করেছ।"[৩]

৪। বিগত বছরের ক্বাযা সিয়াম পালনঃ রমাদ্বান আসার আগে, শাবান মাসে আগের ক্বাযা সিয়ামগুলো করে ফেলা। আম্মাজান আয়িশা (রাঃ) আগের বছরের ক্বাযা সিয়ামগুলো শাবান মাস ছাড়া করতে পারতেন না।[৪] হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন, মা আয়িশা (রাঃ) শাবান মাসে বিগত ক্বাযা রোজা করার গুরুত্ব এ জন্যই বুঝিয়েছেন যেন তা, রমাদ্বান পর্যন্ত তা প্রলম্বিত না হয়।[৫]

৫। রমাদ্বানের বিভিন্ন মাসলা-মাসায়েল সম্পর্কে জানা। রমাদ্বানের গুরুত্ব অনুধাবন করা।

৬। দুনিয়াবী যতরকমের ব্যস্ততা আছে তা রমাদ্বান মাস আসার আগে আগেই শেষ করে ফেলা। রমাদ্বান মাস একনিষ্ঠ হয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদাতে সচেষ্ট থাকা।

৭। পরিবারের সকল সদস্যকে নিয়ে মাশোয়ারা করা। ছোট ছোট মজলিস করা। রমাদ্বানের আহকাম, বিধিবিধান, গুরুত্ব, ফজিলত ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা। পরিবারের ছোটদের সিয়াম পালনে উৎসাহিত করা।
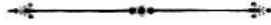
৮। ইসলামিক কিতাবাদি সংগ্রহ করা, নিজে পড়া, মাসজিদের ঈমামদের মাঝে বিতরণ করা যেন, সেখান থেকে উনারা খুতবা বা তাফসীর মাহফিলে সবাইকে নসিহত করতে পারেন।
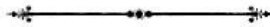
৯। শাবান মাসে বেশী বেশী সিয়াম পালন করে শারীরিক আর মানুষিকভাবে নিজেকে রমাদ্বানের একদম ফিট করে তোলা।

১০। আল কুরআনঃ সালামাহ ইবনে কুহাঈল (রা:) বলেন, শাবান হলো কুরআন তিলাওয়াতকারীদের মাস। শাবান শুরু হলেই আমর ইবনে ক্বায়েস (রা:) তার দোকান বন্ধ করে দিতেন আর কুরআন তিলোওয়াতের জন্য সময় বের করে নিতেন।[৬]

আবু বকর আল-বাল্কি (রহঃ) খুব চমৎকার উক্তি করেছেন। তিনি বলেন, রজব হলো বীজ বপনের মাস, শাবান হলো সেচের মাস আর রমাদ্বান হলো ফসল কর্তনের মাস। তিনি আরো বলেন, রজব মাস হলো বাতাস বওয়ার মাস, শাবান হলো সেই বাতাসে মেঘের ঘনঘটার মাস আর রামাদ্বান হলো বৃষ্টি নামার মাস।[৭]

যদি কেউ রজবে বীজ না বপে তাহলে কোথায় সে পানি সেচ দিবে আর কিভাবেই বা তার ফসল পাকবে?
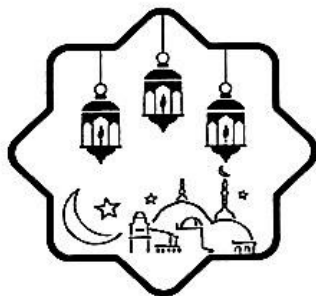
১। আন-নুর আয়াতঃ৩১
২। সহীহ মুসলিম - ৬৬১৩
৩। সূরা ইউনুস, আয়াতঃ৫৮
৪। বুখারীঃ১৮৪৯ ও মুসলিমঃ ১১৪৬
৫। বুখারীর হাদিসের ব্যাখ্যায় তাঁর ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেন।
৬। লাতাইফ-আল-মা'রিফ, ইবনু রজব (রহ)
৭। লাতাইফ-আল-মা'রিফ, পৃষ্ঠাঃ ২১৮, আল-মাক্তাবতুল ইসলাম সংস্করণ।

রমাদ্বানের প্রথম রাতে

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এর নির্দেশনা —

রমাদ্বান মাসের চাঁদ দেখা দিলে উমার (রাঃ) মাগরিব সলাত আদায় করার পর সকলের উদ্দেশ্যে বলতেন, — তোমরা বসো। নিশ্চয়ই রমাদ্বান মাসের সিয়াম তোমাদের উপর দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর কিয়ামুল লাইল তোমাদের উপর দায়িত্ব ও কর্তব্য নয়, তবে তোমাদের কেউ যদি তা আদায় করতে সক্ষম হয় তবে তার করা উচিৎ। এটা তোমাদের জন্য অতিরিক্ত আমল যার ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে অবহিত করেছেন। কাজেই যদি কেউ রাতে কিয়ামুল লাইলে দাঁড়াতে না পারে, সে তাঁর বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুক।

আর তোমরা এ ধরণের কথা বলা থেকে বিরত থাকো — 'অমুক আর অমুক যদি সিয়াম পালন করে তবে আমিও পালন করব, আর অমুক আর অমুক যদি রাতে সলাত আদায় করে তবে আমিও করব। অতএব, সিয়াম ও কিয়াম শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই করবে। আর তোমরা এও জানো যে, সলাতের পর পরবর্তী সলাতের জন্য অপেক্ষা করা সলাতের মধ্যেই থাকারই নামান্তর।'

তোমরা আল্লাহর ঘরে অনর্থক ও আজগুবি কথা বলা থেকে বিরত থাকো,
তোমরা আল্লাহর ঘরে অনর্থক ও আজগুবি কথা বলা থেকে বিরত থাকো,
তোমরা আল্লাহর ঘরে অনর্থক ও আজগুবি কথা বলা থেকে বিরত থাকো,

এই মাস আসার আগের কয়েকটি দিন তোমাদের কেউ রোজা রেখো না।
এই মাস আসার আগের কয়েকটি দিন তোমাদের কেউ রোজা রেখো না।
এই মাস আসার আগের কয়েকটি দিন তোমাদের কেউ রোজা রেখো না।

যতক্ষণ পর্যন্ত চাঁদ দেখা না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সিয়াম শুরু করো না, অতঃপর তা দেখা গেলে ত্রিশদিন পূর্ণ কর। আর পাহাড়ের বুকে আঁধার নেমে না আসা পর্যন্ত তোমার রোজা ভঙ্গ করো না (অর্থ্যাৎ সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত।)[১]

রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

১। তথ্যসূত্রঃ আব্দুর রাজ্জাক আস-সানা'নী, আল-মুসান্নাফঃ ৭৭৪৮

তিনটি জিনিস হলো ঈমান .

১। যখন কোন এক শীতের রাতে কারো নৈশকালীন নির্গমন (স্বপ্নদোষ) হয়, এরপর সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে — তখন শুধু আল্লাহই তাকে দেখতে পায় — অতঃপর সে গোসল করে পবিত্র হয়ে নেয়।

২। তীব্র গরমে যখন কোন বান্দা সিয়াম পালন করে।

৩। জনমানবহীন প্রান্তরে কোন এক বান্দা সলাত আদায় করে, যেখানে আল্লাহ ছাড়া আর কেউই তাকে দেখতে পায়না।

তথ্যসূত্রঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত, ঈমাম আল -বায়হাকী সংকলিত, শুয়াবুল ঈমান - ৫১

সালাফদের সিয়াম

রমাদ্বান মাসে উসমান (রাঃ) এর দিন কাটত সিয়াম পালন করে আর রাত পার হত সলাত ও সিজদায় পড়ে থেকে।[১] উসমান (রাঃ) যেদিন শহীদ হন সেদিনও তিনি সিয়ামরত অবস্থাতেই ছিলেন।[২]

রমাদ্বানের দিনগুলিতে উনারা আল্লাহর ইবাদাতে কাটিয়ে দিতেন, আজেবাজে কথাবার্তা থেকে মুক্ত থাকতেন।

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলতেন, তুমি যখন রোজা রাখবে তখন তোমার কান, চোখ, ও জিহবাকে অনর্থক কথাবার্তা ও খারাপ কাজকর্ম থেকে মুক্ত রাখবে। শান্ত থাকবে এবং রোজা থাকা অবস্থাকে রোজা না থাকার অবস্থার সাথে গুলিয়ে ফেলবে না।[৩]

সালাফে সলেহীন যেভাবে রমাদ্বানে খারাপ কাজকর্ম থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখতেন, একইভাবে বেদ্বীন গুনাহগারদের সুহবত থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখতেন। তাদের সাথে মিশতেন না। এমনকি আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) এর একটি ঘটনা থেকে জানা যায়, তিনি এক বিয়ের দাওয়াতকে উপেক্ষা করেছিলেন শুধুমাত্র সেখানে শারিয়াহ বহির্ভূত কার্যকলাপ থাকার কারণে। সালাফগণ সকল প্রকার পাপাচার ও বিদআত থেকে মুক্ত থাকতেন। এভাবেই উনারা উনাদের আত্মা পবিত্র রাখতেন, বিশুদ্ধ রাখতেন। দুষ্ট লোকদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও দুনিয়াবী চলাফেরা উনাদের কখনই আকৃষ্ট ও মোহাবিষ্ট করতে পারত না। শুধুমাত্র নেককার লোকদের সুহবত ও সান্নিধ্যে থেকে ঈমান তরতাজা রাখতেন। উনাদের মধ্যে কিঞ্চিত পরিমাণ শারিয়াহ বহির্ভূত কোন বিষয়াদি পরিলক্ষিত হত না। ইফতারের সময় হলে উনারা গরীব দুঃখীদের মাঝে ছুটে চলে যেতেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) গরীব দুঃখীদের মাঝে বসে তাদের সাথে ইফতার করতেন। ইফতার গ্রহণের সময় যদি কেউ এসে উনার কাছে এসে খাবার চাইত, তখন তিনি তার নিজের অংশটুকু তাঁকে দিয়ে দিতেন। ইমাম ইবন

শিরিন (রহ) বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) ইফতারির সময় মাঝে মাঝে স্ত্রী সহবাসের মাধ্যমে সিয়াম ভঙ্গ করতেন।[৪]

ঈমাম সুয়ূতী (রহ) বলেন, এর মানে হল, ইফতারের সময়ে ইফতারি গ্রহণের আগে স্ত্রী সহবাস করতেন। এরপর মাগরিব সলাত আদায় করতেন। যাতে করে সলাত এবং অন্যান্য ইবাদাত পূর্ণ মনোযোগের সাথে সম্পন্ন করতে পারেন। কাজেই বিবাহিতরা চাইলে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) এর এই সুন্নাহর উপর জীবনে একবার হলেও আমল করতে পারেন। তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন মাগরিবের সলাত আদায়ে খুব বেশী দেরি না হয়ে যায়।[৫]

কোন এক সালাফ তার মৃত্যুশয্যায় সিয়াম নিয়ে হৃদয় বিদারক একটি উক্তি করেছিলেন। বিদায় বেলায় তাঁকে কাঁদতে দেখে কেউ একজন জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনি কাঁদছেন কেন?" জবাবে তিনি বলেছিলেন, "কাঁদছি এ জন্য যে, অনেকের মত আমি আর রোজা করতে পারব না, অনেকের মত আল্লাহকে আর স্মরণ করতে পারব না, অনেকের মত আর সলাত আদায় করতে পারব না।"[৬]

১। সুনান আল বায়হাক্বীঃ ৪/৩০১
২। আল- হিলিয়াহঃ ১/৫৫
৩। ইবনে আবি শায়িবা, ২/২৪২
৪। আল হায়ছামী, আল মাজমা'আল যাওয়াইদ (৩/১৫৬), উমদাতুল ক্বারী, হাদিসঃ ১৯৫৫, সনদঃ হাসান।
৫। ঈমাম আত-ত্ববারাণী, মু'জাম আল-কাবির (১২/২৬৯) হাদিস নম্বরঃ ১৩০৮০, আল-উইশাহ ফী ফাওয়াইদ আন-নিকাহ
৬। সাইলেন্ট মোমেন্টসঃ দ্য ডেসক্রিপশন অব বিফোর এন্ড আফটার ডেথ আসপেক্টস। দারুস সালাম পাবলিশার্স, রিয়াদঃ২০০৪, পৃষ্ঠাঃ ৫৫

রমাদ্বানে সালাফদের কুরআন তিলাওয়াত

একদিন রাসুল ﷺ সাহাবা আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) কে বললেন, "তুমি আমাকে কুরআন শুনাও"।

> ইবনু মাস'উদ তখন নবীজি ﷺ বললেন, "আমি আপনাকে কিভাবে কুরআন শুনাবো, অথচ আপনার উপরেই তো কুরআন নাযিল হয়।"
>
> রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আমি তোমার নিকট থেকে কুরআন শুনতে ভালোবাসি।"
>
> ইবনু মাস'উদ (রাঃ) অতঃপর সূরা আন-নিসা তিলাওয়াত শুরু করলেন। একচল্লিশ নম্বর আয়াতে পৌঁছালে নবী কারীম ﷺ বললেন, 'থামো।' নবীজী ﷺ এর চোখ অশ্রুশিক্ত হয়ে উঠেছে। দু'চোখ বেয়ে অশ্রুমালা প্রবাহিত হচ্ছে।"[১]

প্রিয় পাঠক! সূরা আন-নিসার ৪১ নম্বর আয়াতে কি ছিল জানেন — যা শুনে রাসুল ﷺ এর চক্ষু মুবারাক অশ্রুশিক্ত হয়ে উঠেছিল? সেই আয়াতটিতে ছিলো —

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا

"সেদিন কেমন হবে, যেদিন আমরা প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী (নবী) আনবো এবং তোমাকে ﷺ সকলের উপরে সাক্ষী বানাবো?"[২]

উক্ত ঘটনার ব্যাপারে হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, "উম্মতের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার উপর সাক্ষ্যদান ও তাদের উপর আযাবের কথা চিন্তা করে সেদিন নবীজি ﷺ কেঁদে ফেলেছিলেন।"[৩]

ইবনুল বাত্তাল (রহ.) বলেন, "এ আয়াত তিলোওয়াত শোনার সময় রাসূল ﷺ এর সামনে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য ভেসে উঠেছিল, এজন্য তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন।"

অথচ আমরা কতবার কুরআন তিলাওয়াত শুনি, নিজেরাও তিলাওয়াত করি, কিন্তু আমাদের অন্তরে তার তাছির হয়না। আমাদের অন্তর কাঁদে না। কিয়ামতের বর্ণনা, হাশরের বর্ণনা, জাহান্নামের বর্ণনা শুনেও আমাদের কোন টেনশান হয়না। আমরা নির্বিকার, ভাবলেশহীন থাকি।

মহান আল্লাহ রমাদ্বান মাসে সালাফদের মত আমাদেরকে বেশী বেশী কুরআন তিলাওয়াতের, বোঝার ও তদ্বনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন।

সালাফদের জীবনচরিত নিয়ে গবেষণা করলে অবাক করা সব বিষয়াদি বের হয়ে আসে। কুরআনের প্রতি উনাদের ভালোবাসা ছিল অনেক বেশী। কুরআনকে উনারা শিশুবাচ্চার মত সবসময় বুকে আগলে ধরে রাখতেন।

আল আস-ওয়াদ (রহ) রমাদ্বানের প্রতি দুই রাতে কুরআন খতম করতেন। মাগরিব ও ইশা সলাতের মাঝের সময়টুকু তিনি ঘুমাতেন। রমাদ্বানের বাইরে অন্যান্য মাসে প্রতি ছয়রাতে একবার করে তিনি কুরআন খতম করতেন।[৪]

ক্বাতাদাহ (রহ) অন্যান্য মাসে সাত দিনে কুরআন খতম করতেন। আর রমাদ্বান মাসে তিনদিনে খতম করতেন। আর রমাদ্বানের শেষ দশ দিনে প্রতি রাতে একবার করে কুরআন খতম করতেন।[৫]

মুজাহিদ (রহ) রমাদ্বানের প্রতি রাতে একবার করে কুরআন খতম করতেন।[৬] মুজাহিদ (রহ) বলেন, "আলি আল-আযাদী রমাদ্বানের প্রতি রাতে কুরআন খতম করতেন।"[৭]

আর রাবিয়ী ইবনু সুলাইমান (রহ) বলেন, "ঈমাম আশ-শাফেঈ (রহ) রমদ্বান মাসে ষাটবার কুরআন খতম করতেন। একবার দিনের বেলায়, আর আরেকবার রাতের বেলায়।"[৮]

আল-ক্বাসিম ইবনুল হাফিজ ইবন আসাকীর (রহ) বলেন, আমার আব্বা জামাআতে সলাত আদায় করতেন ও নিয়মিত সলাত আদায় করতেন। তিনি প্রপ্তি সপ্তাহে একবার করে কুরআন খতম করতেন, আর রমাদ্বানে প্রতিদিন একবার করে খতম করতেন।[৯]

❖ সালাফদের সিয়াম

কুরআন কয়দিনে খতম করা উচিৎ, এ ব্যাপারে ঈমাম নববী (রহ) কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,

"সর্বজনগৃহীত মত হল, এটা বিভিন্ন জনের জন্য বিভিন্ন রকমের। যে কুরআন তিলাওয়াতের সময় বুঝে বুঝে পড়তে চায়, তাহলে পড়ার গতি কমিয়ে যতটুকু পারুক বুঝে বুঝে এগিয়ে যাক। আবার যে ইলম বিতরণের কাজে ব্যস্ত থাকে বা দ্বীনের বিভিন্ন দাওয়াতী কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখে, অথম মুসলিমজাতির স্বার্থে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থাকে, তাহলে তাঁর ওপরে অর্পিত দায়িত্ব ও কাজকে অবজ্ঞা না করে যতটুকু পারুক তিলাওয়াত করবে। আর যদি সে এগুলোর কোনটিতেই সম্পৃক্ত না থাকে তাহলে তাঁর উচিৎ একঘেয়েমী না আসা পর্যন্ত বেশী বেশী কুরআন তিলাওয়াত করা।"[১০]

১। সহিহ বুখারী, হাদীস নং: ৪৫৮২, সহিহ মুসলিম, হা: নং: ৮০০
২। সূরা আন-নিসা, আয়াত:৪১
৩। ফাতহুল বারী: ৯/৯১
৪। আবু নু'ইয়াইম, হিলিয়াতুল আল-আউলিয়াঃ ১-২৫০
৫। আস-সিয়ার (৫/২৭৬)
৬। আত-তিব্বে নববী (পৃষ্ঠাঃ ৭৪), সনদ সহীহ।
৭। তাহযীবুল কামাল (২/৯৮৩)
৮। আস-সিয়ার, (১০/৩৬)
৯। আস-সিয়ার (২০/৩৬)
১০। আত-তিব্বিয়ান, পৃষ্ঠাঃ ৭৬

Contents

সিয়ামের আভ্যন্তরীণ শিক্ষা

— ঈমাম ইবন কুদামাহ আল মাক্বদিসী (রহ)[১]

আপনারা জানেন, সিয়াম হল এমন একটি বিশেষ আমল যার সাথে অন্য কোন আমলের তেমন মিল পাওয়া যায় না। সিয়ামের সাথে আল্লাহর সরাসরি সম্পর্ক। এ জন্যই হাদিসে কুদসীতে তিনি ইরশাদ করেছেন,

'নিশ্চয় রোজা আমার জন্য, আর এর প্রতিদান স্বয়ং আমিই দিব।[২]

আল্লাহর এই ওয়াদা থেকে বোঝা যায়, সিয়ামের মর্যাদা অনেক বেশী। যেভাবে কা'বা ঘরের মর্যাদা তাঁর (আল্লাহর) কাছে অনেক বেশী। যা কুরআনের এই আয়াত থেকে অনুধাবণ করা যায়। মহান আল্লাহ্ ইব্রাহীম (আঃ) আদেশ করেছিলেন — وَطَهِّرْ بَيْتِيَ "এবং আমার ঘরকে পাক সাফ রাখবে."[৩]

নিঃসন্দেহে দুইটি কারণে সিয়ামের গুরুত্ব এত বেশী।

প্রথমতঃ সিয়াম একটি গোপন আমল। যা শুধুমাত্র আল্লাহ্ আর তাঁর বান্দার মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে। কাজেই এখানে রিয়া বা লোক দেখানো কোন বিষয় প্রবেশ করতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ সিয়াম হল আল্লাহর শত্রুদের দমন করা বা অধীনস্থ করা। কিভাবে? সিয়ামের মাধ্যমে প্রবৃত্তির (যা কিনা আদম সন্তানকে ধোঁকা দিয়ে থাকে) গলায় লাগাম দেওয়া হয়। বেশী বেশী খানাপিনা প্রবৃত্তির খোঁড়াক বাড়িয়ে দেয়। খানাপিনা পরিহার করা ছাড়াও এরকম অনেক জানা অজানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি আছে যা থেকে সিয়ামের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

সিয়ামের মুস্তাহাব বিষয়াদিঃ

সাহরী দেরী করে খাওয়া এবং খেজুর দিয়ে দ্রুত ইফতার করা পছন্দনীয়। এ মাসে বেশী বেশী দান সদাকা করাও একটি মুস্তাহাব আমল। বদান্যতা, বেশী বেশী নেক আমল ও দয়াদাক্ষিণ্যতা এ মাসে বাড়িয়ে দেওয়া উচিৎ। আর তা অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দেখানো তরিকা অনুযায়ী। রমাদ্বানে কুরআন তিলাওয়াত ও শেষ দশদিনে ই'তিকাফ করাও মুস্তাহাব। আর এই দশদিনে বেশী বেশী নেক আমলের প্রতি ঝুঁকে পড়া উচিৎ। সহীহ বর্ণনায় এসেছে মা আইশা (রাঃ) বলেন, যখন রমাদ্বানের শেষ দশদিন এসে যেত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোমরের কাপড় শক্ত করে বেঁধে নিতেন।[৪]

উলামাগণ "কাপড় শক্ত করে বেঁধে নেওয়া" এর ব্যাপারে দু'টি মত দিয়েছেন। এক, এই দশদিন স্ত্রীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য, (অর্থ্যাৎ স্ত্রীদের থেকে আলাদা থাকার জন্য)। দুই, নেক আমলের দিকে একান্তভাবে ঝুঁকে থাকা, আর সেদিকেই কঠোরভাবে মনোনিবেশ করার জন্য। তাঁরা এও বলেছেন যে, শেষের দশদিনে নবীজি ﷺ লাইলাতুল ক্বদর তালাশে নিজেকে শতভাগ নিবেদন করতে এভাবে কোমরের কাপড় শক্ত করে বেঁধে নিতেন।

সিয়ামের অন্তর্নিহিত গুপ্তরহস্য ও এর বৈশিষ্টসমূহঃ

সংযমের দিক থেকে সিয়ামের তিনটি পর্যায় রয়েছে। সাধারণ সিয়াম, যথাযথ সিয়াম এবং পরিপূর্ণ সিয়াম। সাধারণ সিয়াম বলতে ঐ সিয়ামকে বুঝায় যার মাধ্যমে কেউ তাঁর উদর ও যৌনাঙ্গকে প্রবৃত্তির খোঁড়াক থেকে হিফাজতে রাখে। যথাযথ সিয়াম বলতে ঐ সিয়ামকে বুঝায় যার মাধ্যমে কেউ, তাঁর দৃষ্টি, জিহবা, হাত, পা, শ্রবণ, চক্ষুদ্বয়সহ শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে অশ্লীল ও ফাহেশা কাজকর্ম থেকে হিফাযতে রাখে। পরিপূর্ণ সিয়াম বলতে, ঐ সিয়ামকে বুঝায় যার মাধ্যমে দুনিয়াবী সকল বিষয়াদির ফিতনা থেকে অন্তর সংযম পালন করে এবং ঐসব চিন্তাভাবনা যা অন্তরকে কুলষিত করে আল্লাহর সাথে দুরত্ব সৃষ্টি করে সেগুলো থেকেও সংযম করে। সিয়ামের গুনাগুণের উপর ভিত্তি করে মহান আল্লাহ্ নির্দিষ্ট পর্যায়ের প্রতিদান বান্দার জন্য বরাদ্দ রেখেছেন।[৫]

যথাযথ সিয়ামের বৈশিষ্ট অনুযায়ী এটা প্রতীয়মান যে, কেউ তাঁর দৃষ্টি অবনত রাখল, নিষিদ্ধ, অপ্রয়োজনীয়, অপচ্ছন্দনীয় ও অনর্থক কথাবার্তা থেকে জবানকে সংযত রাখল এবং সেই সাথে শরীরের বাকী অঙ্গ প্রতঙ্গের হিফাযত করল। ঈমাম বুখারী (রহ) তাঁর সংকলনে একটি হাদিসে এনেছেন, "যে ব্যক্তি রোজা রেখে মিথ্যা বলা বা তার ওপর আমল করা ছাড়ল না, আল্লাহ তায়ালার জন্য ওই ব্যক্তির পানাহার বর্জন করার কোনো প্রয়োজন নেই।"[৬]

যথাযথ সিয়ামের আরেকটি বিশিষ্ট হল, এই সিয়াম পালনরত অবস্থায় কেউ রাতের বেলায় অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ করে না। বরং সে পরিমিত আহার করে। নিশ্চয়ই আদম সন্তান তাঁর পেটের চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো পাত্র পূর্ণ করে না।[৭]

যদি সে রাতের প্রথমভাগে উদরপূর্তি করে খাবার গ্রহণ করে, তাহলে ইবাদাতের জন্য রাতের বাকী অংশকে সে ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারে না। প্রকারান্তরে, যদি সে তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী সাহরী গ্রহণ করে, তাহলে ইফতারীর আগ পর্যন্ত সময়টিকে ইবাদাতের জন্য সে ভালোভাবে কাজে লাগিয়ে দিতে পারে। ভুলে গেলে চলবে না, অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ আমাদের শরীরের অলসতা ও তন্দ্রাভাব নিয়ে আসে। অতিরিক্ত খাবার গ্রহণের কারণে সিয়ামের আহকাম ও উদ্দেশ্য ঠিকঠাক মত আদায় করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। সিয়ামের যে উদ্দেশ্য, নফসের সংযম করে না খেয়ে থাকার স্বাদ আস্বাদন করা - তা উপলব্ধি করার ফুরসৎ হয়ে উঠেনা।
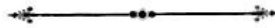
❋ সালাফদের সিয়াম

মুস্তাহাব সিয়ামঃ

বছরের কিছু ফজিলতপূর্ণ দিন আছে যেগুলোতে সিয়াম পালন করা মুস্তাহাব। প্রতি বছরেই এরকম কিছু দিন আছে। যেমন, শাওয়াল মাসের ছয়টি সিয়াম, যা রমাদ্বানের পরের মাসে রাখতে হয়। আরাফাত দিবসের সিয়াম, আশুরা'র সিয়াম, জুলহাজ্জ মাসের দশটি সিয়াম ও মুহাররামের সিয়াম। এ ছাড়াও রয়েছে আইয়ামে বিজ, অথবা মাসের যে কোন তিনদিন সিয়াম এবং সোমবার ও বৃহস্পতিবারের সাপ্তাহিক সিয়াম।

আর প্রতিদিনের সিয়াম পালনের ব্যাপারে সহিহ মুসলিমে আবূ কাতাদাহ মারফত একটি বর্ণনা এসেছে, যেখানে উমার (রাঃ) রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, যদি কেউ প্রতিদিন সিয়াম পালন করে তাঁর ব্যাপারটি কেমন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, সে সিয়াম পালন করেনি, আর না সে সিয়াম ভঙ্গ করেছে, অথবা সে সিয়াম পালন করেনি, সে সিয়াম ভঙ্গ করেনি।"(৮) এই বর্ণনাটি তাদের জন্য যারা লাগাতার সিয়াম পালন করতে চায়, এমনকি সিয়াম পালনের নিষিদ্ধ দিনগুলোতেও।

আরও কিছু নফল সিয়ামের বৈশিষ্টঃ

যাকে বুদ্ধি ও জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাঁর সিয়ামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অবশ্যই জানা থাকতে হবে। অতএব, তাঁর অবশ্যই এমন বোঝা বহন করা উচিৎ যার সামর্থ্য তাঁর আছে। ইবন মাস'উদ (রা) খুব কম সময়ই সিয়াম (নফল) পালন করতেন। তিনি বলতেন, "আমি যখন সিয়াম পালন করি, তখন সলাতে দাঁড়িয়ে দূর্বলতা অনুভব করি। আর আমি সলাতকে (নফল) সিয়ামের উপরে স্থান দেই।"

সাহাবা (রাঃ) আজমাঈনদের অনেকেই সিয়াম পালনরত অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতে দুর্বল হয়ে পড়তেন। এজন্য উনারা কুরআন তিলাওয়াতের ধারা বজায় রাখতে সিয়াম (নফল) কম রাখতেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই তা স্ব স্ব অবস্থান থেকে জ্ঞান রাখে, তাঁর করণীয় কি। তদ্বনুযায়ী সে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে।

১। এই গুরুত্বপূর্ণ রিসালাহটি ঈমাম মুয়াফফাক উদ্দীন কুদামাহ আল মাক্বদিসী (রহ) এর মুখতাসার মিনহাজুল ক্বাসিদীন (পৃষ্ঠা ৩৮-৪১) থেকে অনূদিত। ইংরেজী অনুবাদ, ইসমাইল ইবন আল আরকাম
২। বুখারীঃ ৪/১১৮, মুসলিমঃ ১১৫১
৩। সূরা হাজ্জঃ ২৬
৪। বুখারীঃ (৪/৩২২) ও মুসলিমঃ ১১৪৭
৫। অনুবাদকের নোটঃ এখানে আরো কিছু মন্তব্য প্রয়োজন। এই পর্যায়গুলো মূলত সংযমের উপরে ভিত্তি করে কুদামাহ আল মাক্বদিসী (রহ) ব্যাখ্যা করেছেন। সিয়ামের ক্ষেত্রে সংযমের এই তিনটি পর্যায় পরিপূর্ণ এর হুকুম-আহকাম আদায় করতে হয়। তবে সংযমের এই পর্যায়ের কমবেশী হওয়ার জন্য সিয়াম কাযা করা বা পুনরায় করে দিতে হবে না। কেননা, বান্দা সিয়াম পালন করেছে। আর শেষের পর্যায়গুলো মূলত সিয়ামের গুণাগুণ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। যদি দ্বিতীয় পর্যায় হাসিল না হয়, তাহলে তৃতীয় পর্যায়ের সিয়ামের তুলনায় এই সিয়ামের মূল্য বান্দার কাছে কম বলে বিবেচিত হয়। তবে সয়াম হয়ে যায়। এ জন্য বলা হয়ে থাকে, ইচ্ছাকৃত পানাহার ও যৌনাচারে সিয়াম বাতিল হয়ে যায়, তবে অন্যান্য ফাহেশা কাজ যেমন মিথ্যা বলা, নজরের হিফাজত না করা, এগুলোতে সিয়াম বাতিল হয় না, তবে, এতে গুনাহ হয়।
৬। বুখারীঃ ৪/৯৯)
৭। আহমাদ ৪/১৩২; নাসাঈ, আল-কুবরা, ৮/৫০৯; তিরমিযী ২৩৮০; ইবন মাজাহ: ৩৩৪৯। মুস্তাদরাকে হাকিম ৪/১২১। আর যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।
৮। সহিহ মুসলিম

দুর্ভাগা যারা?

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারে আরোহন করলেন। এরপর তিনি মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে পা রেখে বললেন — "আমীন!"

— এরপর তিনি দ্বিতীয় সিড়িতে পা রেখে বললেন 'আমীন'!

— এরপর তিনি তৃতীয় সিঁড়িতে পা রেখে বললেন "'আমিন'!"

এভাবে তিনবার "আমীন" বলা দেখে মিম্বর থেকে নবীজি ﷺ নামার পর সাহাবাগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা আপনার কাছে আজ এমন জিনিস শুনতে পেলাম যা আগে কখনও শুনতে পাইনি।"

তখন তিনি ﷺ বললেন, "জিব্রীল (আঃ) এসেছিলেন। তিনি বললেন, "ঐ ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হউক, যে রমাদ্বান পাওয়া সত্বেও তার গুনাহ মাফ করে নিতে পারেনি!"

আমি তখন বললাম — 'আমীন' অর্থাৎ হে আল্লাহ, কবুল করুন।"

দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখার পর জীব্রিল (আঃ) বললেন, "ঐ ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হউক, যার কাছে আপনার নাম উচ্চারিত হয়েছে কিন্তু সে আপনার উপর দরূদ পাঠ করেনি।"

তখন আমি বললাম — 'আমীন, অর্থাৎ হে আল্লাহ, কবুল করুন।"

তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখার পর জিব্রীল (আঃ) বললেন, "ঐই ব্যক্তিও আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হোক, যে ব্যক্তি তার বৃদ্ধ মা-বাবা দুইজনকে কিংবা একজনকে পেল, তা সত্ত্বেও তাদের সেবা করে জান্নাত হাসিল করতে পারল না।"

আমি তখন বললাম — "আমিন, অর্থাৎ হে আল্লাহ, কবুল করুন।"[১]

প্রিয় ভাইয়েরা! আমরা এই হাদীস থেকে কি জানলাম? রাসূলুল্লাহ ﷺ, রমাদ্বান পেয়েও যারা নিজেদের গুনাহ মাফ করিয়ে নিতে পারল না তাদের বিরুদ্ধে জিবরীল (আঃ) এর দুআয় গলা মিলিয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছেন। আল্লাহু আকবর! রমাদ্বান পেয়েও যদি আপনার আর আমার গুনাহ মাফ করিয়ে না নিতে পারি, তাহলে আমার চাইতে দূর্ভাগা আর কেউ রইল না।

রমাদ্বানের প্রতি রাতেই সুমহান রব তার অগণিত বান্দাকে জাহান্নাম থেকে আজাদ করে দেন। আমরা কি সেই দলে নিজেদেরকে শামিল করতে পেরেছি? কখনো কি আল্লাহর কাছে জাহান্নাম থেকে মুক্তি চেয়েছি? কখনও কি হাত তুলে বলেছি "আল্লাহুম্মা আজিরনি মিনান্নার", কখনও কি বলেছি, "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন আযাবি জাহান্নাম?"

রমাদ্বান মাসে শাইত্বন অনুপস্থিত থাকে। তাঁকে শিকলে আবদ্ধ করা হয়। শাইত্বন অনুপস্থিত থাকার মাসেও যদি তাওবাহ করে গুনাহ মাফ করিয়ে না নিতে পারি, তাহলে আমার চাইতে অভাগা আর কে আছে এই জগতে? রমাদ্বান যখন চলে যায় তখন আফসোস হবে। রমাদ্বানের প্রতিটি সময় আমার জন্য সোনার হরিনের মত। প্রতিটি মুহূর্ত আমার জন্য অনেক মূল্যবান, দামী। এই সময়কে কাজে লাগিয়ে নিজের পুরাতন, নতুন, প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য, ছোট বড় সকল গুনাহর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। মহান আল্লাহ্ ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। তাঁর ক্ষমার চাইতে আর কোন বড় ক্ষমা নেই। তাঁর রহমতের চাইতে বড় কোন রহমত নেই। তাঁর ভালোবাসার মত ভালো বান্দাকে আর কেউ বাসেনা। এমনকি একজন মা জননীও তাঁর সন্তানকে অতোটা ভালোবাসেন না, যতটুকু না আল্লাহ্ বাসেন।

ফুদাইল বিন ইয়াদ্ব (রহ) একদিন মাসজিদ যাবার পথে দেখলনে এক মহিলা তার সন্তানকে বেদম প্রহার করছে। ছেলেটি মারের চোটে চিৎকার চেঁচামিচি করছে। এক পর্যায়ে তাঁর মায়ের হাত থেকে ছুটে সে ঘর থেকে বেরিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। তার মা রেগেমেগে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল, যেন ফিরে এসে সে আর ঘরে প্রবেশ করতে না পারে।

ফুদাইল বিন ইয়াদ্ব (রহ) যখন মাসজিদ থেকে ফিরছিলেন তখন ছোট্ট ছেলেটিকে দেখলেন কান্নাকাটি শেষে দরজার সামনে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছে। ছেলেটির বুক ভরা আশা, রাগ কমে গেলে তার মা এক সময় দরজা খুলে তাঁকে বুকে জড়িয়ে নিবেন। ফুদ্বাইল (রহ) দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘটনা দেখছিলেন। কিছু সময় পর তার মায়ের হৃদয় নরম হলে, সে দরজা খুলে তাঁর সন্তানকে বুকে জড়িয়ে নিল।

এ দৃশ্য দেখে ফুদ্বাইল বিন ইয়াদ্ব (রহ:) কেঁদে ফেললেন। চোখের পানিতে উনার দাঁড়ি ভিজে গেল। তিনি বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন,

> "সুবহানাল্লাহ! বান্দা যদি ধৈর্য্যধারণ করে আল্লাহর দরজার সামনে আশায় বুক বেঁধে ফিকির জারি রাখে, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তার রহমতের দরজা খুলে দিবেন।"[২]

উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন,

> কয়েকজন বন্দীকে রাসুল ﷺ এর কাছে নিয়ে এসেছিলাম। বন্দীদের মধ্যে এক মহিলাও ছিল। সে তার সন্তানকে (এদিক-সেদিক) খুঁজছিল। যখন সে তাকে খুঁজে পেল, তখন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে দুধপান করাতে লাগল। সন্তানের প্রতি মায়ের এই দরদ দেখে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বললেন, "তোমাদের কি মনে হয়, এই মহিলা কি তার সন্তানকে আগুনে ফেলে দিতে পারবে? আমরা বললাম, "আল্লাহর কসম! এ মহিলা তা করতে পারবে না।"
>
> রাসূল ﷺ বললেন, এই মহিলা তার সন্তানের প্রতি যতটা দয়াশীল আল্লাহ তার বান্দার প্রতি তার চাইতে অধিক দয়াশীল"।[৩] [সুবহানাল্লাহ]

অপর এক হাদীসে এসেছে, "আল্লাহ তার রহমতকে একশত ভাগ করেছেন। তার মধ্যে নিরানব্বই ভাগ তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। আর পৃথিবীতে একভাগ অবতীর্ণ করেছেন। ঐ এক ভাগের কারণেই সৃষ্টজগৎ একে অন্যের

উপর দয়া করে। এমনকি জন্তু তার বাচ্চার উপর থেকে পা তুলে নেয় এই ভয়ে যে, সে ব্যথা পাবে।"[৪]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

> "নিশ্চয়ই আল্লাহর একশটি রহমত আছে, যার মধ্য হতে একটি মাত্র রহমত তিনি মানব-দানব, পশু ও কীটপতঙ্গের মধ্যে অবতীর্ণ করেছেন। ঐ এক ভাগের কারণেই (সৃষ্টজীব) একে অপরকে মায়া করে, তার কারণেই একে অন্যকে দয়া করে এবং তার কারণেই হিংস্র জন্তুরা তাদের সন্তানকে মায়া করে থাকে। বাকী নিরানববইটি আল্লাহ আখেরাতের জন্য রেখে দিয়েছেন, যার দ্বারা তিনি কিয়ামতের দিন আপন বান্দাদের উপর রহম করবেন।"[৫]

কাজেই রবের রহমের ভান্ডার ফুরাবার নয়। সেখানে অফুরন্ত রহমত মজুদ আছে আমার মত পাপী ও জালিমের জন্য। শুধু আমিই কেন যেন আশা হারিয়ে ফেলেছি বোকার মত। ছোট্ট ছেলেটির মত ঘাপটি মেরে তাঁর দরজার সামনে গিয়ে ফিকির জারি করতে পারছি না। বলতে পারছি না "ইয়া আল্লাহ! আমি আর পারছি না! আমার মাথার উপরে পাপের পাহাড়, এই বুঝি ভেঙে পড়ল। রমাদ্বানের এই রহমতের হাওয়া আমার গায়েও লাগিয়ে দাও, আমায় তুমি ক্ষমা করো, আমায় কাছে টেনে নিয়ে তোমার রহমতের চাদরে ঢেকে নাও।"

প্রিয় ভাইয়েরা! বিশ্বাস করুন! এই চাওয়াটুকুই বাকী। রমাদ্বান মাসে আপনার এই আন্তরিক চাওয়াটুকু অপার কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিতে পারে। অভাগা, দুর্ভাগা ও হতভাগাদের কাতার থেকে সৌভাগ্যবানদের দলে শামিল করতে পারে।

ইন্নাল্লাহা গফুরুর রাহীম।

১। সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং: ৪০৯
২। ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন বিখ্যাত তাবেয়ী ফুদ্বাইল বিন ইয়াদ্ব
৩। সহীহুল বুখারী
৪। সহিহ মুসলিম
৫। তিরমিযী

রমাদ্বানের শেষের দশ রাতের আমল

আইশা (রা) বলেন,

> রমাদ্বানে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমাতেন, জাগতেন এবং সলাত আদায় করতেন। তবে, যখন শেষের দশদিন এসে যেত, তখন তিনি সারারাত জাগতেন, কোমর শক্ত করে বেঁধে নিতেন, স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতেন, মাগরিব ও ইশার মাঝে গোসল করতেন, অতঃপর সাহরির সময় রাতের খাবার খেতেন।"[১]

ঈমাম ইবনে জারীর (রহ.) বলেন, রমাদ্বানের শেষ দশ রাতের প্রতি রাতে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে গোসল করা মুস্তাহাব। ঈমাম ইব্রাহীম আন-নাখাই (রহ.) রমদ্বানের শেষ দশরাতে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে গোসল করতেন।

হাফিয ইবনু রজব হাম্বলী (রহ.) বলতেন, রমাদ্বানের শেষ দশ রাতে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে গোসল করা মুস্তাহাব। তিনি আরো বলতেন, এই দশরাতে শুধু গোসলই নয়, উত্তম পোষাক, আতর লাগানোও জুমুআর দিন ও ঈদের দিনের মত মুস্তাহাব। কেননা এই দশরাতের যে কোন রাতে লাইলাতুল ক্বদর হয়ে যেতে পারে।[২]

ঈমাম ইবনে আবি আসিম (রহ.) বলেন, রাসূল ﷺ রমাদ্বানের শেষ দশ রাতে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে গোসল করতেন।

আনাস বিন মালিক (রাঃ) রমাদ্বানের ২৪ দিবাগত রাত্রিতে গোসল করতেন, গায়ে সুগন্ধি মাখতেন, সবচেয়ে সুন্দর পোষাক পরিধান করতেন। পরেরদিন সকালে পোষাক খুলে সুন্দর করে ভাঁজ করে তুলে রাখতেন। পরবর্তী রমাদ্বানের ঐ তারিখ না আসা পর্যন্ত তিনি ঐ পোষাক পরিধান করতেন না।

আইয়ুব আস-সাখতাইয়ান্নি (রাঃ) রমাদ্বানের ২৩ ও ২৪ দিবাগত রাত্রিতে গোসল দিতেন। নতুন পোষাক পরতেন। ধুপ জ্বালিয়ে পোষাক সুগন্ধযুক্ত করতেন।

হাম্মাদ ইবনু সালামাহ (রাঃ) বলেন, "ছাবিত বানানী এবং হুমায়েদ আত-তাউহীল উভয়েই লাইলাতুল ক্বদরের তালাশে তাদের সবচেয়ে সুন্দর পোষাক পরিধান করত। সেরা সুগন্ধি মাখত। ধুপ জ্বালাত। মাসজিদে সুগন্ধি ছিটিয়ে দিত।"

সাহাবী তামিম আদ-দারী (রাঃ) ১০০০ হাজার দিরহাম দিয়ে নতুন পোষাক কিনেছিলেন। যে রাতে লাইলাতুল কদরের সম্ভাবনা দেখা দিত তিনি ঐ রাতে পোষাকটি পরিধান করতেন।

ইবনে জারীর (রহ) উপরের সালাফদের এই ঘটনাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে বলেন, এটা প্রতিষ্ঠিত যে লাইলাতুল কদরের রাত্রিতে গোসল করা, সুন্দর পোষাক পরিধান করা, আতর ও সুগন্ধি মাখা মুস্তাহাব। জুমুআর দিন ও দুই ঈদের দিনের মত সুন্নাহ।[৩]
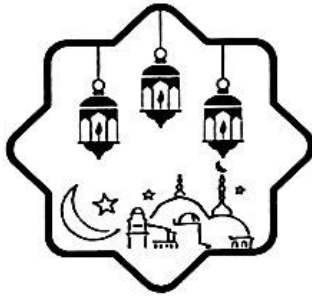
১। ইবন আবী আসিম, ইবন রজব হাম্বলী (৭৯৫ হিজরি), এই হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।
২। এই হাদীসের সনদের ব্যাপারে ইবনু রজব (রহ.) মুক্বারিব বা গ্রহণযোগ্য বলেছেন।
৩। আবু আলিয়াহ ইবন আব্দুল্লাহ, লাতেয়েফ-আল-মা'রিফ থেকে নেওয়া ঘটনা।

রমাদ্বানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদরের তালাশ

— শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহ)

৭০৬ হিজরি। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ (রহ) তখন কায়রোর এক কারাগারে বন্দী ছিলেন। তখন তাকে লাইলাতুল কদরের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

> যাবতীয় হামদ ও সানা একমাত্র আল্লাহর জন্য। রমাদ্বানের শেষ দশ রজনীতে রয়েছে লাইলাত্বল কদর। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে এরকম বর্ণনাই পাওয়া যায়। তিনি ﷺ বলেন, "রমাদ্বানের শেষ দশরাতে তোমরা লাইলাতুল কদরের রাত তালাশ কর।" অন্য বর্ণনায় এসেছে, "এতএব তোমরা শেষ দশ রাতের বেজোড় রাতসমুহে তা খোঁজ করবে।"[১]

তৎসত্ত্বেও বিজোড় রাত্রিগুলো গণনা করতে হবে কতটুকু সময় গত হয়েছে তাঁর হিসাবে, যেমন, একুশে রাত্রিতে, তেইশে রাত্রিতে, পঁচিশে রাত্রিতে, সাতাশে রাত্রিতে এবং ঊনত্রিশতম রাত্রিতে। তবে অন্যভাবেও গণনা করা যেতে পারে, কতদিন বাকী আছে তাঁর উপরে হিসাব করে। যেমন,

> রাসূলুল্লাহ ﷺ, যখন নয় রাত্রি বাকী থাকে সেই রাত্রিতে, যখন সাত রাত্রি বাকী থাকে সেই রাত্রিতে, যখন পাঁচ রাত্রি বাকী থাকে সেই রাত্রিতে, যখন তিন রাত্রি বাকী থাকে সেই রাত্রিতে তালাশ করতে বলেছেন।[২]

অতএব মাস যদি ত্রিশদিনের হয়, তাহলে বিজোড় রাত্রিগুলোতে তালাশ করতে হবে। সেক্ষেত্রে বাইশতম রাত্রিতে নয় রাত্রি বাকী থাকে, চব্বিশতম রাত্রিতে সাত রাত্রি বাকী থাকে। আর আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এর এক সহীহ বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবেই তালাশ করেছেন। তবে যদি মাস ঊনত্রিশ দিনের হয় তাহলে গণনা করতে হবে কতদিন গত হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে।

সুতরাং, এই হচ্ছে পদ্ধতি। তবে মুমিনের জন্য মানানসই হল শেষের দশ রাত্রির প্রতি রাত্রিতেই তালাশ করা। যেমনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "শেষের দশ রাত্রিতে তালাশ কর।"[৩]

আর শেষের সাত রাত্রিতে এটি সংঘটিত হওয়ার ঘোর সম্ভাবনা থাকে। বিশেষ করে সাতাশে রাত্রিতে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে প্রবল। যেমনটি উবাই বিন কা'ব (রা) এর বর্ণনা থেকে জানা যায়। তিনি কসম খেয়ে বলেন, "আল্লাহর কসম আমি এ রাত (লাইলাতুল কদর) সম্পর্কে অধিক জানি। উনাকে যখন প্রশ্ন করা হল, আপনি কিভাবে জানলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, "আমার অধিক জ্ঞান হলো, এটি সে রাত যে রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। আর এটি সাতাশ তারিখের রাত। বিভিন্ন আলামত ও নিদর্শনের ভিত্তিতে যে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের অবহিত করেছেন। যেমন, সেদিন সূর্য উঠবে কিন্তু তাতে আলোক রশ্মি থাকবে না।"[৪]

অতএব, উবাই বিন কা'ব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে একটি নির্দিষ্ট দিনের কথা উল্লেখ করেছেন। এবং সে রাতের পরের দিনের সূর্য উঠবে কিন্তু তাতে আলোক রশ্মি খুব একটা থাকবে না, একদম ম্লান ও মলিন থাকবে, সূর্য তাঁর তেজস্বীরূপ হারাবে, সেদিনটি খুব গরম হবে না, বরং নাতিশীতোষ্ণ হবে। এই রাতের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ কাউকে কাউকে স্বপ্নযোগে অথবা জাগ্রত অবস্থায় কোন আলোকরশ্মির মাধ্যমে জানিয়েও দিতে পারেন। অথবা সে দেখবে কেউ তাঁকে বলে দিচ্ছে, "আজকে লাইলাতুল কদর।" অথবা কারো হৃদয় স্বাক্ষ্য দিবে যে, আজকেই সেই মহামান্বিত লাইলাতুল কদরের রাত। আর এ ব্যাপারে আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

তথ্যসূত্রঃ মাজমুউ'ল ফাতওয়া, ২৫/২৮৪-২৮৬), ইংরেজী অনুবাদ আবূ তালহা দাউদ ইবন রোনাল্ড বারবাঙ্ক (রহ)

১। বুখারীঃ ২০১৬, মুসলিমঃ ১১৬৭/২১৭, আবূ সাঈদ খুদরী ও আইশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।
২। বুখারীঃ ২০২১, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত।
৩। বুখারীঃ ২০২০, মুসলিমঃ ১১৬৯ , আইশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।
৪। মুসলিমঃ ৭৬২

শেষ ভালো যার সব ভাল তাঁর

রমাদ্বানে আল্লাহর ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়া শর্তসাপেক্ষ। এটা নির্ভর করে আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে হিফাজতে থাকার উপর। জমহুর উলামাগণ বলেন, রমাদ্বানে গুনাহ থেকে মুক্তির বিষয়টি ছগিরা গুনাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা সহিহ মুসলিমের এক হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

> "দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সলাত, এক জুমুআ থেকে আরেক জুমুআর সলাত, এবং এক রমাদ্বান থেকে আরেক রমাদ্বান এগুলো গুনাহ মুক্তির কারণ হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ কবিরাহ গুনাহয় না লিপ্ত হয়।"

তবে, কোন কোন সালাফ এই মতের বিপক্ষে রায় দিয়েছে। ইবন মুনছির (রহ) লাইলাতুল কদরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আশা করা যায় এ রাতে ছগিরা ও কবিরা উভয় গুনাহকেই ক্ষমা করে দেওয়া হয়।"

তবে অধিকাংশ উলামা বলেছেন, কবির গুনাহর জন্য খাস দিলে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইতে হবে। ইখলাসের সাথে ক্ষমা না চাইলে কবিরা গুনাহ ক্ষমা করা হবে না।

কাজেই লাইলাতুল কদর সম্পর্কিত সকল হাদীস একসাথে করলে, এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যদি কেউ সে রাতে ক্ষমা প্রার্থণা করে, যদিও ঐ রাত লাইলাতুল কদরের রাত না হয়, তবুও সে ক্ষমা পেয়ে যাবে।

রমাদ্বান মাসে সিয়াম পালন করলেও হাদীসের ঘোষণানুযায়ী বান্দার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। এটাও বর্ণিত আছে যে, সিয়াম পালনের জন্য বান্দাকে রমাদ্বানের শেষ রাতে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস, ঈমাম আহমদ (রহ) তাঁর মুসনাদে সংকলন করেন, যেখানে বলা হয়েছে,

> যারা সিয়াম পালন করে রমাদ্বানের শেষ রাত্রিতে তাঁদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা কি লাইলাতুল কদরের রাতে? রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন, "না, নিশ্চয়ই শ্রমিককে তাঁর কাজ শেষে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।"

আয-যুহ্রী (রহ) বলেন, ঈদুল ফিতরের দিন, লোকেরা যখন ঈদের সলাত আদায় করতে ঈদগাহ ময়দানে যায়, তখন মহান আল্লাহ্ তাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, "ওহ আমার বান্দারা! নিশ্চয়ই তোমরা আমার জন্য সিয়াম পালন করেছ, আমার জন্য সলাতে দাঁড়িয়েছ, যাও বাড়ি ফিরে যাও, তোমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হয়েছে।"

যে ব্যক্তি রোজা রাখে এবং আল্লাহর সকল ফরজ হুকুম আহকাম মেনে চলে তারাই একমাত্র আল্লাহর প্রকৃত বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত। আর যারা এসব ফরজ বিষয়ে অবহেলা ও শৈথিল্য প্রদর্শন করে, এবং আল্লাহর হক পরিপূর্ণভাবে আদায় করে না, ধ্বংস তাদের জন্য অনিবার্য হয়ে যায়। যদি কেউ খামখেয়ালিপনায় দুনিয়াবী কার্যকলাপে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে ভয়াবহ আযাব।

সালাফগণ তাদের কর্মগুলোকে পরিশুদ্ধ করার পিছনে মেহনত করতেন, কিভাবে আমলে বিশুদ্ধতা আনা যায় তাঁর পিছনে শ্রম দিতেন। এরপর উনারা তাদের আমলগুলো কবুলের ব্যাপারে ফিকির জারি করতেন। এত আমল করার পরেও ভয় পেতেন, উনাদের আমল কবুল হবে কিনা। উনারা তো সেই সকল সোনা মানুষ যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় বিরাজ করত - এই জন্য যে, উনাদের ওপর আরোপিত হুকুম-আহকাম পালনে নিজেরা কতটুকু সচেষ্ট থাকতে পেরেছেন। আলী ইবন আবি তালিব (রাঃ) বলতেন, "তোমার আমল কবুল হবে কি না তাঁর ব্যাপারে চিন্তিত না হয়ে, বরং আমল কিভাবে সম্পন্ন করবে তার পিছনে মনোযোগ দাও। তোমরা কি আল্লাহর এই বাণী শুনোনি?

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

"আল্লাহ মুত্তাকীদের পক্ষ থেকেই তো গ্রহণ করেন"

(আল মায়েদা, আয়াতঃ২৭)

ফুদ্বালা (রহ) বলেন, "আমি যদি জানতে পারি যে, আমার সরিষা দানা পরিমাণ কোন আমল আল্লাহ তায়ালা কবুল করেছেন, তাহলে তা আমার কাছে দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে, তার চাইতে অধিক প্রিয় হবে।

কেননা আল্লাহ্ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তো মুত্তাকীদের পক্ষ থেকেই গ্রহণ করেন"

✦ ✦ ✦

মালিক বিন দিনার (রহ) বলতেন, "আমল সম্পাদন করার চাইতে, আমল কবুলের বিষয়টি কঠিন, এই ভয়টা যেন থাকে।"

✦ ✦ ✦

আতা আস-সুলামী (রহ) বলতেন, "আল্লাহভীরুদের ভয় এই যে, তাঁরা ভাবে, তাদের নেক আমলগুলো হয়ত আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর সামনে উপস্থাপন করতে পারেননি।"

✦ ✦ ✦

আব্দুল আযীয ইবনু আবী রুউয়াদ (রহ) বলেন, "আমি এমন অনেকজনের সাথে মিশেছি, যারা আমলের ব্যাপারে খুবই যত্মবান ছিলেন, তবুও আমল সম্পন্ন করার পর তাদের চোখেমুখে শুধু বিষণ্ণতার ছাপই দেখতে পেতাম, এই ভয়ে যে আল্লাহ্ তাদের আমল কবুল করবেন কি না?"

✦ ✦ ✦

ঈদুল ফিতরের দিনে সালাফদের কার কারো চোখেমুখে বিষন্নতার ছাপ ফুটে উঠত। তাঁদেরকে যখন বলা হত, আজকে তো খুশি ও আনন্দের দিন। তাঁরা বলতেন, আপনি সত্যই বলেছেন, তবে আমি তো আল্লাহরই দাস! আমার রব আমাকে যে আমলের আদেশ দিয়েছিলেন আমি জানিনা তিনি তা আমার তরফ থেকে কবুল করেছেন কি না?

✦ ✦ ✦

ঈদুল ফিতরের দিন ওয়াহব (রহ) একদল লোককে হাসাহাসি করতে দেখে বললেন, যদি তাদের সিয়াম কবুল হয়ে থাকে, তাহলে জেনে রেখো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা এরকম নয়, আর যদি কবুল না হয়ে থাকে, তাহলে ভীতিগ্রস্তদের অবস্থা এরকম হতে পারে না।

হাসান আল বসরী (রহ) বলতেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা রমাদ্বানকে তাঁর সৃষ্টিকূলের জন্য উপার্জনের মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছেন। এ মাসে তাঁরা আল্লাহর

হুকুম আহকাম মেনে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতাইয় লিপ্ত হয়। কেউ কেউ এই প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীর মুকুট পরিধান করে, কেউ কেউ পিছনে পড়ে রয়। সেদিনের দৃশ্য কতই না সুন্দর! যেদিন নেককারদের দেখা যাবে হাসিখুশি খেলতামাশায় আর বদকারদের দেখা যাবে পরাজিত ভুলণ্ঠিত অবস্থায়।

✤ ✤ ✤

হযরত আলী (রাঃ) রমাদ্বানের শেষ দিনে সবাইকে ডেকে ডেকে বলতেন, "কোথায় সেই বিজয়ী, তাঁকে ডাকো অভিনন্দন জানাই। কোথায় সেই বিজেতা আসো তাঁকে শান্তনা দেই। হে বিজয়ী! আমরা তোমাকে অভিনন্দন জানাই! ওহে বিজেতা! আল্লাহ্ তোমার দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করে দিন!"

✤ ✤ ✤

বরকতময় এই রমাদ্বান মাস। এই মাসে আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার উপায়ান্তর অনেক।

- রোজাদারদের ইফতার করানো।
- আল্লাহর কোন বান্দার দুঃখ তাড়ানো।
- অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ। হাদিসে এসেছে, "যে ব্যক্তি রমাদ্বানে আল্লাহকে স্মরণ করবে, তাঁর গুনাহর খাতা মাফ করে দেওয়া হবে, আর যে তাঁকে ডাকবে সে হতাশাগ্রস্থ হবে না।"
- ক্ষমা প্রার্থণা করা।
- রোজা রাখার সময় (সাহরী) ও রোজা ভাঙ্গার সময় (ইফতার) সময় বান্দার দুআ আল্লাহর দরবারে কবুল হয়। আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে শুধুমাত্র যারা প্রত্যাখ্যান করবে তাঁরা ব্যতীত। আশেপাশে থাকা লোকসকল তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ওহ আবু হুরাইরা! কারা প্রত্যাখ্যান করবে? তিনি বললেন, যারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবেনা তাঁরা ব্যতীত।"
- ফিরিশিতারা সিয়াম পালনকারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থণা করেন, যতক্ষণ না সে সিয়াম ভঙ্গ করে।

রমাদ্বান মাসজুড়ে এত এত ক্ষমা অর্জনের উপায় থাকতেও, যে ব্যক্তি এই সূবর্ণ সুযোগ হেলায়ফেলায় কাটিয়ে দিবে, তাঁর চাইতে অভাগা এই দুনিয়ায় আর কেউ থাকতে পারে না। এ ধরণের লোকদের ধ্বংসের ব্যাপারে নবীজি ﷺ তিনবার 'আমীন' বলে জিব্রীল (আঃ) এর সাথে গলা মিলিয়েছিলেন।

✦ ✦ ✦

কাতাদাহ (রহ) বলতেন, "যে ব্যক্তি রমাদ্বান মাসে তাঁর গুনাহ মাফ করিয়ে নিতে পারল না, তাহলে রমাদ্বানের বাইরে অন্য কোন সময়ে তাঁর গুনাহ মাফ করিয়ে নিতে পারবে না।"

অর্থ্যাৎ, যদি কেউ রমাদ্বানের মত এমন সুবর্ণ সুযোগ ছেড়ে দেয়, তাহলে বাকী মাসগুলোতেও সে সুযোগ সন্ধানী হবে না, হেলায়ফেলায় কাটিয়ে দিবে। এ ব্যাপারে একটি হাদিস আছে, যেখানে বলা আছে, 'যে ব্যক্তি রমাদ্বানে ক্ষমা হাসিল করতে পারলো না, তাহলে কবে সে তা হাসিল করবে?"

কাজেই, এ মাসে যদি কেউ ক্ষমা না পেয়ে থাকে, তাহলে কবে ক্ষমা পাবে? লাইতুল কদরের মত হাজার মাসের চাইতে উত্তম এমন রাতে যদি কেউ ক্ষমা না পায়, তাহলে সে কবে পাবে? রমাদ্বান মাসে যদি কেউ নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে না পারে, তাহলে কবে করবে? অবহেলা আর অবজ্ঞার অসুখ থেকে কখন সে নিজেকে সুস্থ করে তুলবে?
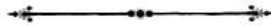
অবশ্যই ঈদুল ফিতরের দিন এই উম্মাহর আনন্দের দিন। কেননা, রোজাদারেরা এ মাসেই ক্ষমা পেয়ে যায়, জাহান্নাম থেকে আজাদ হয়ে যায়। গুনাহগারের দল নেককারদের সাথে একাকার হয়ে যায়। এ দিনে এতসংখ্যক লোক জাহান্নাম থেকে মুক্তি পায়, যা বছরের অন্য কোন দিনে পায় না। কাজেই, যে ব্যক্তি ঈদের দিনে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে যায়, আনন্দ তো তাঁর জন্যই, আর যে জাহান্নাম থেকে আজাদি পায় না তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে কঠিন আযাব। আল্লাহর ক্ষমা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি নির্ভর করে রমাদ্বানের দিনগুলোতে সিয়াম পালন এবং রাতের বেলায় সলাতে দণ্ডায়মান হওয়ার উপর। অতএব যে কারো উচিৎ রমাদ্বানে আল্লাহর তারিফ ও প্রশংসা করা, দিনে সিয়াম পালন করা, রাতে সলাত আদায় করা। তাঁর দয়া ভিক্ষা চাওয়া, গুনাহ থেকে বারবার

ক্ষমা চাও, জাহান্নাম থেকে বেশী বেশী মুক্তি চাওয়া। অন্তরে তাঁর ভয়ভীতি লালন পালন করে তাঁর স্মরণে কাটিয়ে দেওয়া।

আল্লাহর ক্ষমা হাসিলের কিছু উপায়ঃ

- আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করলে ও মেনে নিলে, এর দ্বারা গুনাহ মাফ হয়। এর দ্বারা গুনাহ ধুয়ে মুছে যায়। কোন গুনাহই আর অবশিষ্ট থাকে না।

- বেশী বেশী ইস্তিগফার পাঠ, আল্লাহর ক্ষমা অর্জনের অনন্য উপায়। ইস্তেগফার মানেই আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়া। আর রোজাদের দুআ কবুল হয়।

+ + +

হাসান আল বসরী (রহ) বলেন, "বেশী বেশী ইস্তেগফার করো, নিঃসন্দেহে তুমি জানো না আল্লাহর রহমত তোমার ওপর কখন বর্ষিত হয়।"

+ + +

লুকমান (আঃ) তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন, "হে আমার ছেলে! তোমার জিহবাকে আল্লাহর ক্ষমা চাওয়াতে ব্যস্ত রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহর নির্ধারিত সময় রয়েছে, যে সময়ে তিনি দুআ ফিরিয়ে দেন না।"

+ + +

এ ব্যাপারে শাইত্বনের বক্তব্যে এসেছে, 'আমি মানবজাতিকে গুনাহের মাধ্যমে ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছি, আর তাঁরা আমাকে লা-ইলাহা-ইলাল্লাহ এবং ইস্তিগফারের মাধ্যমে ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছে।'

+ + +

ইস্তিগফার হলো সকল আমলের উপসংহার। রমাদ্বানের সকল আমলের শেষে ইস্তিগফার হল মুক্তির দরজা। সিয়াম, সলাত, দুআ ইত্যাদি আমলের সাথে ইস্তিগফার, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ বান্দাকে ক্ষমা করে দিবেন। এজন্যই রমাদ্বানে সকল আমলের শেষে আমাদের উচিৎ বেশী বেশী আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থণা করা।
উমার বিন আব্দুল আযীয (রহ) তাঁর গভর্ণর বরারব চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, রমাদ্বান মাস যেন ইস্তিগফার ও সদাক্বা (সদাক্বাতুল ফিতর) দিয়ে শেষ হয়।

কেননা, নিঃসন্দেহে, সদাক্বাতুল ফিতর হল রমাদ্বানের বান্দার অনর্থক কথবার্তা ও ফাহেশা কাযকর্মের কাফফারা এবং ইস্তিগফার হল আমলের ক্রটি-বিচ্যুতি যার কারণে সিয়ামের ক্ষতি সাধিত হয়, তার কাফফারা।

উমার বিন আব্দুল আযীয (রহ) তাঁর চিঠিতে আরো লিখেন, তোমাদের পিতা আদম (আঃ) যে দুআ পড়ে ক্ষমা চেয়েছিল, তোমরাও পড়বে –

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَٰسِرِينَ

রব্বানা জালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফিরলানা ওয়া তার্‌ হামনা লানাকূ নান্না মিনাল খাসিরীন।

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় জুলুম করেছি, যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন তবে অবশ্য আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।"

তোমরা নূহ (আঃ) যে দুআ করেছিল, সেই দু'আও পড়বে

وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ

ওয়া ইল্লা তাগফিরলী, ওয়া তারহামনী, আকুম্মিনাল খসিরীন

"আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমাকে দয়া না করেন, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।"

আর তোমরা মুসা (আঃ) এর মত বলবে,

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

রব্বি ইন্নি যলামতু নাফসী ফাগফিরলী ফাগফারালাহু, ইন্নাহু হুয়াল গাফুরুর রাহীম

হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের উপর জুলুম করে ফেলেছি। অতএব, আমাকে ক্ষমা করুন।

অতঃপর তোমরা নবী ইউনুস (আঃ) এর মত বলবে

لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ্‌ জলিমীন।

আপনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। অবশ্যই আমি পাপী।

সিয়াম হল জাহান্নামে থেকে বাঁচার জন্য ঢাল যতক্ষণ না কেউ অনর্থক ও আজেবাজে কথার দ্বারা এই ঢালকে ভেঙে ফেলে। ইস্তিগফার সেই ঢালকে বহাল তবিয়তে রাখে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আম্মাজান আইশা (রাঃ) কে লাইলাতুল কদরের রাত্রিতে ইস্তিগফারের জন্য একটি বিশেষ দুআ শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

কেননা, ঈমানদারগণ রমাদ্বান মাসজুড়ে দিনে রোজা রাখে আর রাতে সলাতে দণ্ডায়মান হয়, যখন মাস শেষ হতে থাকে আর লাইলাতুল কদরের সময় আসতে থাকে, তখন যে কেউ এই দুআ পড়ে সারা মাসের ঘাটতি বা কমতির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থণা করতে পারে।

\+ + +

ইয়াহইয়া বিন মুয়ায (রহ) বলেন,
"বুদ্ধিমান তো সেই লোক যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর ক্ষমা হাসিল করা। বুদ্ধিমান তো সে নয় যে শুধু মুখে মুখে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, আর তাঁর অন্তর গুনাহর সাথে জড়িয়ে থাকে, রমাদ্বানের পর পুনরায় গুনাহতে ফিরে যাওয়ার মানসিকতা রাখে। তাঁর সিয়াম প্রত্যাখ্যাত এবং তা তাঁর মুখে ওপর ছুঁড়ে ফেলা হয়।"

\+ + +

সাহাবী কা'ব (রাঃ) বলেন,

"যে ব্যক্তি রমাদ্বানে রোজা রেখে মনে মনে বলল, এই মাস শেষ হলেই আমি ফের আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হব, তাহলে সেই লোকের সিয়াম বাতিল। আর যে ব্যক্তি রমাদ্বানে রোজা রেখে মনে মনে বলল, এ মাস শেষ হয়ে গেলেও আমি আল্লাহর অবাধ্যতা করব না, তাহলে কোন প্রশ্ন ব্যতিরিকে ঐ লোকের ঠিকানা জান্নাতে হবে।"

হে আল্লাহর বান্দারা! নিঃসন্দেহে আর অল্প কিছুদিনের মাঝেই রমাদ্বান মাস চলে যাবে। যে ব্যক্তি রমাদ্বান মাস ভালোভাবে কাটিয়ে দিতে পারবে, তাঁর সামনের দিনগুলো ভালোভাবেই কাটবে। আর এখনও যাদের মধ্যে ঘাটতি বা

কমতি আছে, তাদের উচিৎ ভালোভাবে মাসটি শেষ করে দেওয়া। কেননা, শেষ ভাল যার, সব ভালো তাঁর। রমাদ্বানের বাকী দিনগুলো হেলায়ফেলায় কাটিয়ে না দিয়ে এর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করুন। এই মাসকে বিদায় দিন সর্বোত্তম উপায়ে, শান্তির সাথে।

মুমিনের অন্তর এ মাসের বিদায় ঘনিয়ে এলে কাঁদে, হা-হুতাশ করে। এর চলে যাওয়া দেখে শোকে বিহবল হয়ে পড়ে। আপনজন কেউ বিদায় নিলে যেমন অনুভূত হয়, ঠিক তেমনি রমাদ্বান চলে যাওয়াতেও তাঁর কষ্ট অনুভূত হয়। রমাদ্বান চলে যাওয়াতে এই যদি হয় মুমিনের অবস্থা, তাহলে যারা দিনরাত অবহেলা আর অবজ্ঞায় কাটিয়ে দিয়েছে তাদের অবস্থা কি? একজন অবহেলাকারীর মেকি কান্না তখন আর কি কাজে আসবে তাঁর জন্য? এই মিসকিনদের কত করে বোঝানো হয়েছে, কিন্তু তাঁরা বুঝতে চায়নি। পরিশুদ্ধির জন্য তাঁদেরকে হাজারবার নসিহত দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাতে তাঁরা সাড়া দেয়নি। চোখের সামনে কতজনকে দেখেছে আমল কুড়িয়ে নিতে, তবুও সে নির্বিকার থেকেছে। আল্লাহর কত অবাধ্য বান্দাকে অনুগত হতে দেখেছে, তবুও সে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। আর এখন এসে সে বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে মেকী কান্না করছে। নিজের ভুলের অপনোদন করতে চাচ্ছে। যার কোন প্রতিকার এখন আর নেই।[১] (অনুবাদ সমাপ্ত)

রসুল ﷺ ইরশাদ করেন,

> কোন ব্যক্তি এমন আমল করে যা দেখে মানুষ মনে করে যে, সে জান্নাতবাসী হবে, অথচ সে জাহান্নামী। আবার কোন কোন মানুষের আমল দেখে মানুষ মনে করে যে, সে জাহান্নামী হবে, অথচ সে জান্নাতী। কেননা সর্বশেষ আমলের উপরই ফলাফল নির্ভরশীল। [২]

✦ ✦ ✦

ইবনুল যাওজি (রহ) বলেছেন,

إن الخيل إذا شارفت نهاية المضمار بذلت قصارى جهدها لتفوز بالسباق

فلا تكن الخيل أفطن منك! فإنما الأعمال بالخواتيم

..فإنك إذا لم تحسن الاستقبال لعلك تحسن الوداع

"যখন রেসের ঘোড়া বুঝতে পারে আর অল্পক্ষণ বাদেই পথ শেষ হয়ে যাবে তখন সে তার সর্বশক্তি দিয়ে রেস জিততে উদ্যত হয়; রেসের ঘোড়া যেন তোমার চাইতে চালাক না হয়; প্রকৃতপক্ষে, আমল বিচার করা হয় তা কিভাবে শেষ হয় তার মাধ্যমে; সুতরাং যদি ভালোভাবে রামাদ্বান শুরু নাও করতে পারো শেষদিকেরটা যেন ভালোয় ভালোয় বিদায় করতে পারো"।[৩]

ইবনে তাইমিয়াহ (রহ) বলেছেন, العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات

"কোন জিনিসের শেষ কত পরিপূর্ণভাবে হয়েছে সেটাতেই রয়েছে শিক্ষা, শুরুর ভুল-ত্রুটির মধ্যে কোন শিক্ষা নেই।"

* * *

হাসান আল-বাসরী (রহ) একই কথা বলেছেন। তিনি বলেন,

"যতটুকু (সময়) বাকী আছে তার মধ্যে তোমার আমল বাড়িয়ে নাও এবং তোমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে যতটুকু (সময়) গত হয়েছে তার জন্য; যতটুকু সময় পাও তার জন্য জীবন ঢেলে দাও, কারণ তুমি জানো না কখন তোমার আত্মা আল্লাহর রহমতের দিকে ধাবিত হবে।"[৫]

সুতরাং এই অন্তিম মুহূর্তে আমাদের সবারই উচিৎ রমাদ্বানের প্রতিটি দিনকে গুরুত্ব দেওয়া এবং প্রতিটি দিনকে জীবনের শেষ দিন মনে করে আল্লাহর নাফরমানী থেকে দূরে থাকা। এবং নিজেকে সৎআমলের দিকে ধাবিত করা। শপিংএ ব্যস্ত না থেকে নিজেকে প্রতিপালকের দিকে ন্যস্ত করা। মাত্র দশটা দিন, শেষের এই দশটা রাত, হতে পারে আপনার ও আমার দিন বদলের রাত।

শেষের এই দশ দিনে আমরা যে সব আমল করতে পারি ইন শা আল্লাহ

- সলাত (ফরজ, সুন্নাহ ও ক্বিয়ামুল লাইল ও অন্যান্য নফল সলাত)
- কুরআন তিলাওয়াত
- তাসবীহ, তাহলীল ও তাহমীদ
- দরূদ
- দান-সদাক্বা (বেশী বেশী)

❁ সালাফদের সিয়াম

- এদিক সেদিক বেহুদা ঘোরাফেরা না করা।
- সময় মত ইফতার ও সাহরী করা
- মাসজিদে একদম সামনের কাতারে দাঁড়িয়ে ফরজ স্বলাত আদায় করা।
- খোশ গল্প ও আড্ডাবাজী ত্যাগ করা।
- দুনিয়াবিমুখ হয়ে আল্লাহমুখী হওয়া।
- ফেসবুক, ইন্টারেন্ট, ইউটিউব ও অনলাইনে বেহুদা সময় না কাটানো।
- ঈদ শপিং আগেভাগেই করে রাখা, এই দশটিন শুধুমাত্র ইবাদাতের জন্য বরাদ্দ রাখা।
- বেশী বেশী দুআ করা।
- ইস্তিগফার তথা বেশী বেশী ক্ষমা প্রার্থণা করা।

হে মহান আল্লাহ্! রামাদ্বানের বাকী দিনগুলিতে আমাদেরকে বেশী বেশী আমলে সালেহ করার তাওফীক দিন। সেই সাথে মৃত্যুর পূর্বে বেশি বেশি নেক আমল করার ফুরসৎ দান করেন। আপনার সন্তুষ্টি নিয়ে প্রত্যাবর্তন করার ব্যবস্থা করে দেন। (আমীন)

১। এই অধ্যায়টি ঈমাম ইবনু রজব হাম্বলী (রহ) এর লাতায়েফুল মা'রিফ এর শেষ অধ্যায় থেকে অনূদিত। শাইখ আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন কাসিম এই অধ্যায়টিকে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেছেন। সেই সাথে ইবনু তাইমিয়াহ (রহ) এর "মাজমুউ আল ফাতোয়া" থেকেও কিছু অংশ তিনি যোগ করেছেন। আর একদম শেষের অংশ আমি অধমের (রাজিব হাসান) পক্ষ থেকে এখানে যোগ করা হয়েছে।

২। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪৯৩, শারহুস সুন্নাহ, হাদীস নং ৭৯ বর্ণনাকারী: সাহল ইবনে সা'দ (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

৩।https://www.islamicboard.com/fasting-ramadhan-amp-eid-ul-fitr/134326258-horses.html

৪।https://www.islamicboard.com/fasting-ramadhan-amp-eid-ul-fitr/134326258-horses.html

৫।https://www.islamicboard.com/fasting-ramadhan-amp-eid-ul-fitr/-134340303regret-wasting-ramadan.html